যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৮ মে ২০১৭

# কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

## থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

শহর কলকাতার আনাচে-কানাচে আট থেকে আশি সবাই যখন ভুগছে সেলফি জ্বরে; স্যোশ্যাল মিডিয়ায় সেলিব্রিটিদের সাথে সেলফি সেখানে স্টেটাস সিম্বল। হোর্ডিং আর ব্যানারেও সেলফির রমরমা। সেখানেই এই হোর্ডিং-ব্যানারের ভিড়ে কোথাও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাঙালির রবীন্দ্রনাথ। ২৫শে বৈশাখ মানে সত্যিই কি আলাদা কিছু? অথচ বাঙালির আবেগ মানেই ছিল রবীন্দ্রনাথ! আবহমান সংস্কৃতির ক্রমশ বদলে যাওয়া, কলকাতার প্রতিটা রং তাঁর খুব চেনা। এখানে দাড়িয়েই হয়তো বিশ্বকবি দেখবেন আরও কয়েক প্রজন্মের বদল।

ফোটো: **প্রলয় হাজরা** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

## আমার চোখে কলকাতা

**জর্জ বেকার** (অভিনেতা, সাংসদ)

আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা অসমে। কলকাতায় আসা সিনেমা করার সূত্রে। সেই ১৯৭০ সালে 'চামেলী মেমসাহেব' ছবির জন্য কলকাতায় আসা-যাওয়া শুরু। তখন অসমের লোকজনের মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম যে ওদের ধারণা ছিল পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে। কলকাতায় আসার পর আমারও একটা ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। তখন থেকেই আমি ভেবেছিলাম আমিও এখানে থেকে যতটা পারি এখানকার ভাষাটা রপ্ত করে নেব। মুম্বইতে যাওয়ার আমার কোনওরকম ইচ্ছে ছিল না। কলকাতার মানুষদের মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল। রাস্তাঘাট কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। ১৯৮০ সাল থেকে আমি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থাকা শুরু করলাম।

সিনেমা, নাটক, টেলিভিশন, যাত্রা— সব কিছুই এই শহরে। আমার জীবনের মতোই এই শহরের নানান রকম পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছেও। তবে একটা সময়ের পর থেকে যেভাবে পরিবর্তন শুরু হয়েছে সেটা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দিক থেকে এই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে। সেটা হল সব দিক থেকে একটা অবহেলার মনোভাব তৈরি হয়েছে।

এর প্রভাব মানুষের মধ্যেও পড়েছে। মানসিকতা এবং মানবিকতার দিক থেকে মানুষের মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসেছে। আগে মানুষের মধ্যে যে আন্তরিকতা, একে অন্যের প্রতি যে আবেগ ছিল সেটা এখন আর নেই। আগে রাস্তায় কাউকে ডেকে যদি কোনও ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হতো সে ভালো ভাবেই বলে দিত আর এখন কানে হেডফোন লাগিয়ে রাখে, কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে— আমি তো জানি না, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন, এইগুলো খুব খারাপ লাগে।

আমার একটা জিনিস মনে হয় এখন সমাজ, শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, চিকিৎসাব্যবস্থা সব কিছুর মধ্যেই রাজনৈতিক প্রভাব খুব সাংঘাতিকভাবে লক্ষ করা যায়। যাই ঘটুক না কেন সেখানে কোনও না কোনও ভাবে রাজনীতি জড়িয়ে পড়বে। *এরপর দু'য়ের পাতায়*

## ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

# মা বলেছে, এটাও একটা ঠাকুর

**প্রীতম চক্রবর্তী**

ঘটনাটা প্রায় বছরখানেক আগের। আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে ২৫শে বৈশাখে কোনও ছুটি থাকে না। তাই যথারীতি আর পাঁচটা দিনের সাথে এই দিনের রুটিনেও বিশেষ কোনও ফারাক হয় না। ফেসবুক না থাকলে হয়তো আমি জানতেই পারতাম না সেই দিনটা পঁচিশে বৈশাখ। অথচ স্কুল-কলেজে পড়ার দিনগুলোতে এই দিনটার জন্য অপেক্ষার সীমা থাকত না। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আবৃত্তির রিহার্সাল, নাটকের মহড়া, এমনকী রাতের পর রাত জেগে অনুষ্ঠানের প্ল্যানিং কত কী! আসলে সময়ের সাথে সাথে জীবন-জীবিকার দায়বদ্ধতা মানুষকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করায় যেখানে আবেগ, অনুভুতি অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়।

অন্য দিনগুলোর মতো ৯টা ৫৫-র রানাঘাট লোকালে ঝুলতে ঝুলতে শিয়ালদহ। সেখান থেকে সাউথের ট্রেন ধরে বালিগঞ্জ। রোজকার মতোই ট্রেন কমপার্টমেন্টেই হাসিঠাট্টা, ভিত্তিহীন কত না গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা। যার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও রাজনীতি, কখনও ধর্ম, এর ছেলের পড়াশোনা, ওর মায়ের ট্রিটমেন্ট তো কখনও ট্রেনের ড্রাইভারের রান্নাঘর অবধি সীমা-পরিসীমাহীন আলোচনা।

ট্রেন থেকে নেমে হালকা মেজাজেই ফ্লাইওভারে উঠছি, এমন সময় একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। কয়েক সেকেন্ড কেমন যেন থমকে গেলাম। ময়লা কলার ছেঁড়া জামা পরা একটা ছেলে, হয়তো প্ল্যাটফর্মেই থাকে বা পাশের বস্তিতে; একটা কাচ-ফাটা রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ফোটোকে জলে ভেজানো কাপড় দিয়ে মুছছে। সিঁড়ি দিয়ে যে কয়েক পা উঠেছিলাম, আবার নেমে এলাম। ছেলেটির কাছে গেলাম। বললাম, এটা কার ছবি জানিস? ছেলেটি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল। যেন মনে হচ্ছিল আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি জজসাহেবের কোনও গুরুত্বপূর্ণ রায় শুনব বলে। ছেলেটি বলল, এটা একটা ঠাকুর। রবিঠাকুর। আমি বললাম, ছবিটা কোথা থেকে পেলি?

উত্তরে ছেলেটি বলে ক্লাব থেকে ফেলে দিয়েছিল, তাই আমি নিয়ে আমার কাছে রেখেছি। মা বলেছে, এটাও একটা ঠাকুর। রবিঠাকুর। ফের আমি বললাম, তোর নাম কী? ছেলেটি বলল সাইদুল ইসলাম। মন ও মননের আনাচে-কানাচে একটা বিদ্যুতের রেখা যেন ঝিলিক মেরে গেল।

মনের মধ্যে কী একটা আক্ষেপ তোলপাড় করতে লাগল। মনে হল একটা বিষাদ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। যখন আমাদের দেশ জুড়ে, সমাজ জুড়ে উত্তপ্ত আবহাওয়া। ধর্মের জন্য, জাতের জন্য মানুষে মানুষে এত বিদ্বেষ এত হানাহানি, কোথাও যেন এই ছোট্ট ছেলেটা চোখে আঙুল দিয়ে অনেক কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে। আর রবিঠাকুর যেন কোথাও একটা সম্প্রীতির সুতো ধরে রেখেছে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৮ মে ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
**শর্মিলা চন্দ্র** (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**



# রাতের তফাৎ

**বীথি চট্টোপাধ্যায়** (লেখিকা)

শুরু থেকেই কলকাতার নাইটক্লাবগুলো আমার পছন্দ ছিল না। ইউরোপের নাইটক্লাবে দেখেছি কী স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন উপভোগ। আমেরিকায় কী অনাবিল আনন্দ। ইউরোপ-আমেরিকার নাইটক্লাবগুলোতে জুয়া রয়েছে অপ্রতিরোধ্যভাবে। আর রয়েছে যথার্থ স্বাধীনতা। খাদ্য-পানীয়র সঙ্গে জুয়া আর স্বাধীনতার অনন্য হাতছানির জন্যই আমেরিকা, ইউরোপের নাইটক্লাবগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গোয়া আর সিকিমের গ্যাংটকেও রাতের ক্লাবগুলিতে রয়েছে জুয়া খেলবার সমস্তরকম বন্দোবস্ত। গরিবদেশে জুয়া অনুচিত যদি কেউ মনে করেন তাহলে বলব, ঠিকই গরিবদেশে রাস্তাঘাটে জুয়া কখনওই মানা যায় না, কিন্তু তারকাখচিত দামি হোটেল আর অভিজাত ক্লাবগুলো কী দোষ করল? সেখানে তো গরিব মানুষ যাবেন না। আজকের বড়লোক কখনও জুয়া খেলে গরিব হয়ে যায় না, বরং বড়লোকের অর্থ থেকে রাজস্ব বাড়তে পারত কলকাতার দামি জায়গাগুলোতে জুয়ার ব্যবস্থা রাখলে। কলকাতার কোনও নাইটক্লাবে জুয়া নেই।

ক্যামাক স্ট্রিটের ইম্পেরিয়াল ক্লাব বলে একটা ছোট ঘর আছে, সেখানে একটু তাসের জুয়া চলে, কিন্তু সেখানে মেয়েদের বসতে দেওয়া হয় না। রেসকোর্সে যে জুয়ার ব্যবস্থা সেটাও উপভোগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যে কারণে সার্কাসে বাঘকে দিয়ে স্যালুট করানো বা হাতিকে চেয়ারের ওপর নাচানো অন্যায়, সেই একই অন্যায় ছায়া ফেলে রেসকোর্সের সবুজে। আমি জুয়া খেলে আনন্দ করব তার জন্যে ঘোড়া দৌড়বে কেন? একদিকে তামিলনাড়ুর ষাঁড়ের লড়াই উঠে গিয়েছে বলে দূর থেকে হাততালি দেব, অন্যদিকে রেসকোর্সে কোনও দোষ দেখব না সেটা তো হতে পারে না। ভারতে সার্কাসে পশুপাখির খেলা নিষিদ্ধ হয়েছে, ষাঁড়ের লড়াই, মুরগির লড়াই নিষিদ্ধ হয়েছে সেই একই পথে অবলা পশুদের ওপর বাজি ধরে কলকাতা সহ ভারতের সমস্ত শহরে রেসকোর্সের ঘোড়দৌড়ও দ্রুত নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। আমি জুয়া খেলব বলে ঘোড়া দৌড়বে কেন? টাকা বাজি রেখে ঘোড়ার দৌড় মধ্যযুগীয় ইউরোপের একটা ঔপনিবেশিক খেলা। সেটা আর কদিন টিকবে? জুয়া খেলবার হলে নিজে বরং ক্যাসিনোয় বসে জুয়া খেলব। নিজের আনন্দ নিজের জোরে করতে হয়, সেটা যেন অন্য কোনও মানুষ, পশুপাখি বা প্রকৃতির ওপর অন্যায্য চাপ না ফেলে এটা খেয়াল করতে হয় আনন্দ করবার আগে। না হলে সমাজটা অসুখে ভোগে। জীবনটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কলকাতায় কোনও ক্যাসিনো কালচার নেই। জুয়া বলতে এখানে লোকে বোঝে ব্রিজের নীচে অন্ধকারের সাট্টা। সেইসব সাট্টার ঠেকে বেশিরভাগ দিন আনা দিন খাওয়া পুরুষ। যখন তখন সেখানে বেরিয়ে পড়ে চাকু, রাতভোর চলে চোলাই। কলকাতার এইসব সাট্টার ঠেকের আশেপাশেই পাওয়া যায় হেরোইন, পুরিয়া, পাতা। সেসব নিয়ে অনেক গল্পও লেখা আছে এই শহরের ফুটপাতে ফুটপাতে। অথচ কলকাতার দামি জায়গাগুলো আশ্চর্যভাবে জুয়া বিবর্জিত। এর ফলে কলকাতার নাইটক্লাবে আমার দমবন্ধ লাগে।

শুধু জুয়া নেই বলেই কি দমবন্ধ লাগে? না শুধু জুয়ার জন্যে নয়। বড়লোক দেশগুলোতে দেখেছি নাইটক্লাবগুলোতে কেউ কাউকে পরোয়া করে না। কেউ বেজায় সেজে আসে, কেউ একেবারে একটা ঢোলা টি-শার্ট পরে এসে মজা করে। যে যার নিজের মতো। আমি শাড়ি পরে, শান্তিনিকেতনের ব্যাগ নিয়ে বসে রয়েছি ক্যাসিনোয়, সেটা কেউ খেয়ালই করছে না। কে কী পরেছে অথবা কে মোটা, কে রোগা, কে কালো কুচকুচে, কে বাদামি, কে সাদা এসব কিছু কারুর দ্রষ্টব্যই নয়। আমার তো মনে হয় আমেরিকা সবচেয়ে বেশি সাদা-কালোর বিভেদ মুছে দিতে পেরেছে তার নাইটক্লাবগুলিতে। কেউ আমাকে দেখছে কিনা কিংবা আমার পোশাকটা মানানসই হয়েছে কিনা এই বোধ নিয়ে কী আর অনাবিল স্বাধীন আনন্দ করা যায়! আমাদের রাতের ক্লাবে এই গভীর হীনম্মন্যতা আমার দম বন্ধ করে দেয়। যে যা খুশি ভাবুক আজ প্রাণ খুলে যা ইচ্ছে করব। এই পরিসরটুকুই তো আনন্দ-ফুর্তির পুঁজি। কিন্তু আমাদের এখানে কী হয়? নৈশ প্রমোদে যেতে হলে পা থেকে মাথা অবধি চকচকে সুসজ্জিত হতে হয়। রোগা মানানসই চেহারা হতে হয়, সঙ্গে সঙ্গী থাকতে হয়। আমি যেন বেমানান না হয়ে যাই সেইদিকে খেয়াল রাখতে হয়। নিজের সাজ-পোশাক; চেহারা নিয়ে এত চূড়ান্ত খেয়াল রেখে কি আসল আমোদ-প্রমোদ হয় নাকি? শাড়ি বা সালোয়ার কামিজের সঙ্গে সস্তা চটের ব্যাগ নিয়ে নিউ ইয়র্ক, লাস ভেগাস বা প্যারিসের নাইটক্লাবে গেলে কেউ খেয়ালই করে না, কিন্তু ওভাবে কলকাতার নিশি জীবনে প্রবেশ করলে লোকে চোখ কপালে তুলবে। বিনোদনের মধ্যে যে চরম স্বাধীনতার বার্তা নিহিত আছে সেটা কলকাতার রাতগুলো যেন এখনও জানে না। কেউ চাইলে মাইক্রো মিনি স্কার্ট পরে বাজারে যাবে, আবার কেউ চাইলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ঢোলা সালোয়ারে নাইটক্লাবে গিয়ে মদ খাবে। কোনও মিথ বা ধারণার দাসত্ব না করে কীভাবে উপভোগ করতে হয় সে-কথা এই শহরের নৈশ জীবন জানে না। সত্তর বছর কাটল, তবু এ এখনও শহর রাত জাগে যেন সাহেবদের ব্যর্থ অনুকরণে। তার সঙ্গে আবার এ-শহরের নিশি জাগরণে এসে মিশেছে আমাদের দেশের দারিদ্র্য। কত বাধ্য হয়ে করা দরদাম, কত ক্লান্ত মেয়ের নিষ্প্রাণ ঘরে ফেরা লেগে থাকে শহরের রাতগুলিতে। দেখলে বোঝা যায় মেয়েটি হয়তো উলুবেড়িয়া বা বাঁশদ্রোণী থেকে কলকাতা আসে সপ্তাহে কয়েকদিনের জন্যে। গায়ে সস্তা স্প্যাগোটি টপ, মাথায় উঁকি দিচ্ছে সিঁদুরের রেখা। কোনও ছেলের আবার চুল লাল, একটু বয়স্ক মহিলা দেখলেই গাড়ি অবধি পিছন পিছন আসছে। বোঝা যায় ও আজ কোনও ক্রেতা পায়নি। কলকাতার রাত জীবনে যত পয়সার বিনিময়ে যৌনতা চলে পাশ্চাত্য দেশে তার ছিটেফোঁটাও হয় না। এ শহরে রাতের জীবনে যৌনতা কানের কাছে সারাক্ষণ ফিসফিস করে বলে, 'তুমি কি একা? তুমি কি কোনও সঙ্গী চাও? মাত্র কিছু টাকা দিলেই তোমার সব চাওয়া মিটে যাবে।' আমেরিকা-ইউরোপের রাতগুলি সেখানে বলে 'একা তো কী হয়েছে, একা হও, দোকা হও। এসো খোলা আকাশের মতো মন নিয়ে উপভোগ করো মদ, জুয়া আর পরিবেশকে।' এ-শহরে সেখানে দামি নিশি নিলয় মানে বয়স্ক নারী আর পুরুষদের করুণ সঙ্গী খোঁজা। বড়লোকের ছেলেমেয়ে যারা আসে তারা নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত নিজেদের অজান্তে। পোশাকের নিরিখে তারা নিমেষে বিচার করে নেয় মানুষকে। নিজস্বতার কোনও স্পর্ধা নেই তাদের। সত্যিকার মস্তানি নেই। আমার ভালো লাগে না। এ-শহরে রাতে আমার যাবার মতো কোনও জায়গা নেই। শহরের রাত এখনও স্বাধীন হয়নি। কোনও অসহযোগ আন্দোলনে কলকাতার প্রতিটি রাত মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে সেকথা ভাবি মাঝে মাঝে।

## আমার চোখে কলকাতা (প্রথম পাতার পর)

আর একটা ব্যাপার মনে হয় কলকাতায় চারিদিকে এত আলো, কোনও সময় বিদ্যুতের সংকট হবে না তো? তবে আগের থেকে রাস্তাঘাট কিছুটা উন্নত হয়েছে ঠিকই, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যাপারটা এখনও সব জায়গায় লক্ষ করা যায় না।

সম্প্রতি কয়েকটা বিষয় খুবই খারাপ লাগছে, সেটা হল কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই সঙ্গীন। বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনের উপর যেভাবে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ছে সত্যি কিছু বলার নেই। থানায় ঢুকে পুলিশকে যেভাবে মারধর করে খুবই চোখে লাগে। পুলিশকে মারধর করলে কি সমস্যার সমাধান হবে? ওরাও তো মানুষ। একটা সময় ছিল যখন কলকাতা পুলিশকে মানুষ অন্য চোখে দেখত। কেউ কলকাতা পুলিশে থাকলে তাকে অন্যরকম সম্মান করা হতো। যবে থেকে পুলিশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে তবে থেকে সমস্যা বেড়েছে। ওরাও ভাবছে যদি রাজনৈতিক নেতাদের দাসত্ব করা যায় তাহলে ওঁদের জীবন বাঁচবে। ওদেরও তো ফ্যামিলি রয়েছে। তবে সব রাজনৈতিক নেতা সমান সেটাও বলব না।

আরও একটা ব্যাপার খারাপ লাগে সেটা হল বর্তমানে চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে, এটা কেন হবে? মানুষের জীবন নিয়ে এমনটা করা তো ঠিক নয়! পাশাপাশি যাঁরা প্রিয়জনকে হারান, সেটা মানা খুবই কঠিন তবুও বলব, আপনারা আইনি ব্যবস্থা নিন, ক্ষতিপূরণ দাবি করুন, কিন্তু ভাঙচুর করবেন না। এতে অন্য মানুষের চিকিৎসার ক্ষতি হতে পারে। একটা জিনিস ভাঙতে কতক্ষণ লাগে, কিন্তু ওই হাসপাতালটাই তৈরি করতে অনেক সময় লেগেছে।

বর্তমানে মানুষ বড্ড বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে— এটা খুবই চিন্তার বিষয়। একটা সময় 'আমরা' কথাটা খুব ব্যবহার হতো, আমরা কজন ক্লাব, আমরা সঙ্গী ক্লাব ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এখন 'আমরা' ভেঙে 'আমার' হয়ে গেছে।

আগের কলকাতার সঙ্গে এখনকার কলকাতার একটা মিল রয়েছে সেটা হল আগে কারওর পকেটে ৫০ টাকা থাকলে সে পেট ভরে খেতে পারত, এখনও সেটা সম্ভব। এটা আর অন্য কোথাও সম্ভব নয়। কলকাতার মিষ্টি আর দই আমার খুব ফেভারিট।

শেষে একটাই কথা বলব ঘড়ির কাঁটা ১২টা থেকে চলতে শুরু করে ১২টাতেই ফিরে আসবে। সেরকমই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরিবর্তনটা যেন সকলের ভালোর জন্যই হয়।

এই প্রথম কোনও বাংলা দৈনিকে সপ্তাহে সাতদিনই
**রঙিন সাপ্লি**
আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৮ মে ২০১৭

# ঠাকুরবাড়ি

**সোমনাথ আদক**

এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ফিসফিস করে বলছেন, জানিস তো গীতাঞ্জলীর সবকটা কবিতা কিন্তু আমার লেখা। রবি আমার থেকেই তো নিয়েছে। এই কথা শুনে শ্রোতারা তো বিস্ময়ে হতবাক। সবাই এ ওর দিকে তাকাচ্ছে, আর বলছে, কী অন্যায় কী অন্যায়। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক উঠে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, রবি প্রাইজ পেয়েছে, রবি প্রাইজ পেয়েছে। শ্রোতারাও তাঁর পেছনে ছুটলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে ধরা গেলে শ্রোতারা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার লেখা নিজের বলে চালিয়ে রবিদাদু প্রাইজ পেয়েছে, এতে তুমি এত আনন্দ করছ কেন? ভদ্রলোক এমন প্রশ্ন শুনে ভীষণ রেগে গেলেন। চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে বললেন, তোদের এত হিংসে কেন রে, আমার ছোট ভাই নোবেল পেয়েছে আমি আনন্দ করব না তো কে করবে? কার লেখা তাতে কী?

কার কথা বলছি বলুন তো? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই অখ্যাত দাদাদের অন্যতম, আমি তাঁর কথাই বলছি। সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সোমেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৫৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র ২ বছরের বড় সোমেন্দ্রনাথ। সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ওঁদের ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ শৈশব থেকে বাল্যকাল একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে যে-বাড়িতে, সেই বাড়িটির নাম ঠাকুরবাড়ি। সোমেন্দ্রনাথ বেশিরভাগ সময় জোড়াসাঁকোতেই থাকতেন, মাঝে মাঝে জমিদারির কাছে শিলাইদহে যেতেন। সালটা ১৮৭৯, তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর, সেবার শিলাইদহে গিয়ে তিনি বায়ুরোগে আক্রান্ত হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ছেলে দীপেন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং এরপর কিছুদিন তাঁকে কবিরাজ রসিকলালের অধীনে রাখা হয়। তারপর আবার তিনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। তবে তিনি ওদের আর এক দাদা বীরেন্দ্রনাথের মতো উন্মাদ ছিলেন না। মাঝেমধ্যে রোগটা দেখা দিত আবার সেরেও উঠতেন। তাই তাঁকে পাগলা গারদে পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি কখনও।

বিচিত্র পরিবার এই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির। একদিকে প্রতিভাবান লোকের বাস, অন্যদিকে তার বিপরীত কোটির মানুষও অনেক। আর আজ আমি চলে এসেছি প্রায় তিনশো বছরের পুরনো সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

রবীন্দ্র সরণি আর বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল থেকে একটু এগোতেই পাওয়া গেল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। এই লেনের মধ্যেই কয়েকটি সবুজ বাগান ঘেরা লাল বাড়ির সারি। সরু গলি। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র সরণি ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর উপর এখন দুটি প্রকাণ্ড গেটওয়ে নির্মাণ করেছে। কিন্তু এ তো আজকের জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। মেছুয়া বাজার থেকে কীভাবে হয়ে উঠল জোড়াসাঁকো? ঠাকুরবাড়ি থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠার পেছনেই-বা কী ইতিহাস লুকিয়ে আছে? জানব। তার আগে কান পাতব ঠাকুরবাড়ির অন্তরমহলে।

ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস যে প্রায় তিনশো বছরের তা অনেকেরই জানা। বাংলার নবজাগরণে এই পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এই পরিবারের অনেকেই বাণিজ্য, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংগীত জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আগে এই পরিবারটির কিন্তু পদবি ছিল কুশারি। যাঁরা এসেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলা থেকে। পঞ্চানন ও শুকদেব নামে দু'জন কুশারি গোবিন্দপুরে বসত গড়ে তোলেন। যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত কলকাতা শহরের একটি গ্রাম। তাঁরা জাহাজের ব্যবসা শুরু করেন। ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে প্রতিবেশীরা তাদের ঠাকুরমশাই বলে ডাকতেন। ব্রিটিশরা দেশের ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর ঠাকুর তাদের পারিবারিক পদবিতে রূপান্তরিত হয়। ইংরেজদের সুবিধার্থে তা 'টেগোর'-এ বদলে যায়। দর্পনারায়ণ ঠাকুর (১৭৩১-১৭৯১) পরিবারের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি টাকা ঋণ দিয়ে মুনাফা লাভ করেন এবং উপার্জনের সাথে সমান তালে খরচ করেন। দর্পনারায়ণের সাথে তাঁর ভাই নীলমণির বিতণ্ডা হলে, নীলমণি (প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঠাকুর্দা) তাঁর পরিবার নিয়ে ১৭৮৪ সালে পাথুরিয়াঘাটা ছেড়ে 'মেছুয়া বাজার'-এ চলে আসেন। পরবর্তীকালে মৎস্যজীবী প্রধান এই মেছুয়া বাজারেই নাম হয় জোড়াসাঁকো।

যে-জমির ওপর আজকের ঠাকুরবাড়ি তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে সেই জমিটি নীলমণি ঠাকুর দেবত্তর সম্পত্তি হিসাবে লাভ করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে। নীলমণি যখন সেই জমিতে বিশাল ইমারতটি তৈরি করেন জোড়াসাঁকো তখনও মেছুয়াদের নামেই পরিচিত ছিল। নীলমণি থেকে তাঁর নাতি দ্বারকানাথ পর্যন্ত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল জমিদারি ও ব্যবসাদারির কেন্দ্রস্থল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে ব্রহ্মধর্মের প্রসার বঙ্গ-সংস্কৃতির মুকুটে ঠাকুরবাড়ির এক নতুন পালক সংযোজন। তবে জমিদারির কেন্দ্র থেকে সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তানসন্ততি। যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের নাম। রবীন্দ্রনাথের জন্ম, সাহিত্যচর্চা, নাট্যাভিনয়, নোবেলপ্রাপ্তি, নাইটহুড ত্যাগ ও মহাপ্রয়াণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এই বাড়িটি জড়িত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা, বউদি ও দিদিদের সুবাদে তৎকালীন ভারত ও বহির্ভারতের বহু গুণিজন এসেছিলেন এ-বাড়িতে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকেই ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা একে একে জোড়াসাঁকোর বাস তুলে অন্যত্র চলে যান। বাড়িটির দক্ষিণ-পূর্বের অংশের মালিকানা থেকে যায় গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির তরফে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পনেরো লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়িটা কিনে নেন। পরে বাড়ির তদানীন্তন মালিক হাইকোর্টে মামলা করে আরও তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন। ফলে সুরেন্দ্রনাথ বেশ অর্থ সংকটে পড়েন। তখন সুরেন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানালে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকারি অনুমোদনের শর্ত হিসাবে ঠাকুরবাড়িতে সংগীত, নাটক ও নৃত্য শিক্ষার অ্যাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়। এরপর ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাট্য ও সংগীত অ্যাকাডেমি। উদয়শঙ্কর, অহীন্দ্র চৌধুরী ও রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে নৃত্য, নাট্য ও সংগীত বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসন্ন রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথের (রবীন্দ্রনাথের ছেলে) সম্মতি পেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরো বাড়ির দখল নেয়। ১৯৬২ সালের ১০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আইন। সেই বছরেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাপ্রাঙ্গণটি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবস্থিত।

১৯৬১ সালের ৮ মে জহরলাল নেহরু ঠাকুরবাড়িতে একটি প্রদর্শশালার উদ্বোধন করেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। পরে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বর্তমানে সংগ্রহশালাটি ছড়িয়ে পড়েছে ঠাকুরবাড়ির তিনটি ভবনেই। দক্ষিণে ঠাকুরবাড়ির প্রাচীনতম অংশ, মহর্ষি ভবন ও বিচিত্রা ভবন। এখানে শুধু ঠাকুরবাড়ির ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীই রাখা নেই আছে ঠাকুর পরিবার ও বাংলা নবজাগরণের সাক্ষ্য বহনকারী অনেক স্মারক, শিল্পকীর্তি ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য নথি।

মহর্ষি ভবনের দ্বিতীয় তল থেকেই রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার শুরু। এই ভবনের প্রধান দর্শনীয় ঘরটির নাম 'রবীন্দ্র প্রয়াণ কক্ষ'। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলার ১৩৪৮ সনের ২২ শ্রাবণ) এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিক যে জায়গাটিতে রবীন্দ্রনাথ মারা যান সেই জায়গাটিকে একটি কাঠের বেষ্টনি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এই ভবনেই আছে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীদেবীর দুটি কক্ষ। প্রণয় কক্ষের পাশের ঘরে রয়েছে একটি অনুচ্চ-গদিযুক্ত লম্বা পালঙ্ক। বই রাখা তাক, কাচের বাক্সে রাখা পান খাওয়ার রূপোর সরঞ্জাম ও একটি বেতের চেয়ার। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ক্লাস নেওয়ার ছবিও আছে এ-ঘরেই। পরের ঘরে কবির ব্যবহৃত পোশাক ও তাঁর নানা বয়সের ছবি। এর কাছেই রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর। রান্নাঘরের মেঝেতে উনুন। দেওয়ালে আটকানো তাকে প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো চিনামাটির পাত্র। মহর্ষি ভবনের দ্বিতলেই 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের স্মরণীয় সেই দক্ষিণের বারান্দা। পূর্ব দিকের ঘরটিকে বলে 'বংশ-পঞ্জি কক্ষ'। মহর্ষি ভবনের তিনতলার একটি ঘরে রাখা আছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের তৈলচিত্র। এছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। মহর্ষি ভবনের ঠিক পাশেই, ১৮৮৭ সালে তৈরি হয় বিচিত্রা ভবন। এই ভবনটি আজও কবির বহু সাহিত্য সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে নীরবে। এখানেই অনুষ্ঠিত হতো সাহিত্যসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯১৭ সালে এই বিচিত্রা ভবনেই 'ডাকঘর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। রবীন্দ্র মঞ্চায়নের একটি ছবিও এখানে রাখা আছে। বিচিত্রা ভবনের পাশেই থাকতেন মৃণালিনী দেবী। ১৯০২ সালে এ-ঘরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এখানেই তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে। ঠাকুরবাড়ির প্রাচীন অংশটি নির্মিত হয় ১৭৮৪ সালে। বাড়ির পুরনো অংশের কেন্দ্রস্থলে আছে ঠাকুরদালান। আগে এখানে দুর্গাপুজো হতো। পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর স্থানটি নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি উৎসর্গ করেন। ঠাকুর দালানে বেদির বিপরীতে আছে একটি স্থায়ী মঞ্চ। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে। এই মঞ্চে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকে নট-নাট্যকার হিসাবে প্রথম আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথের।

ইটের পাঁজর, সিলিংয়ের কড়ি-বরগা ছুঁয়ে ঠাকুরবাড়ি অন্তরমহলের ইতিহাস আজও ফল্গুধারার মতো প্রবহমান। মৃদুমন্দ বাতাসে না চন্দনের গন্ধ হয়তো নেই, ভেসে বেড়াচ্ছে অগ্নিবীণার সুর। তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, বয়ে যাবে অনন্তকালের রথের চাকা। আগামী হবে ইতিহাসের গর্ভধারিণী। তবু পরশখানি পুরনো হবে না কখনও জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়ির।

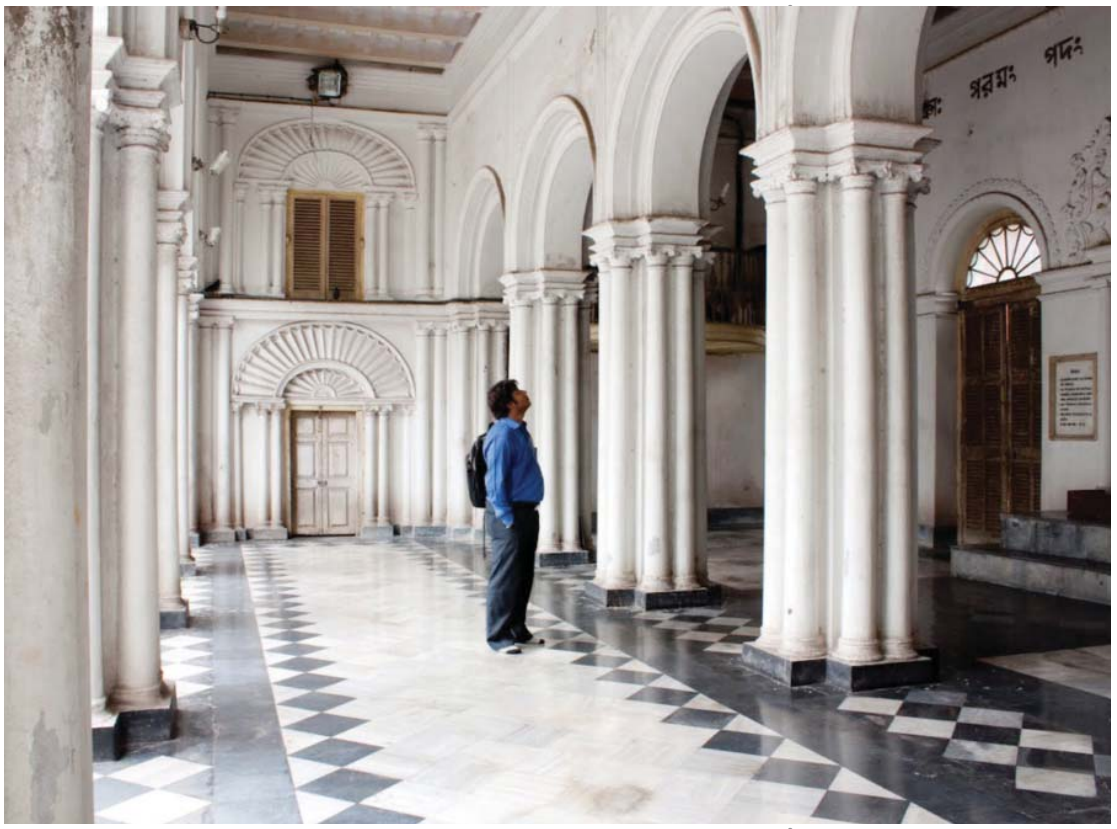

যে-জমির ওপর আজকের ঠাকুরবাড়ি তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে সেই জমিটি নীলমণি ঠাকুর দেবত্তর সম্পত্তি হিসাবে লাভ করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ৮ মে ২০১৭



# সময়ের ঝড়ে হারিয়ে যাচ্ছে কালবৈশাখী

**জয় চক্রবর্তী**

আম কুড়ানোর, ঘুড়ি ওড়ানোর রঙিন দুপুরগুলো যদি ফেরত চাই আমাকে ফেরত দিতে পারবে? জানি পারবে না, ইচ্ছা থাকলেও পারবে না। বদলে আমাকে তুমি যা দেবে তা তো আমি চাই না, কখনও চাইতামও না। শহরের ব্যস্ত জীবন তো আমার কখনওই পছন্দ ছিল না। তাও তো তুমি আমাকে দিয়েছ...। আর আমিও তাই মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু এভাবে শুধু তুমি আমার চাওয়াগুলোকেই শেষ করে দাওনি। একটা প্রজন্ম, বলা ভালো পরবর্তী সব প্রজন্মের থেকেই তার শৈশব কেড়ে নিচ্ছ। ঝড়ের সন্ধ্যায় আম কুড়ানো তো দূরের কথা কালবৈশাখী কী জিনিস তা হয়তো পরের প্রজন্ম জানতেই পারবে না। সেই জন্য তোমার উপর আমার অনেক অভিমান। কিন্তু তুমি তো আমার সমাজব্যবস্থা, আমার আধুনিক জীবন, আমার পরিবেশ। তাই তোমাকে প্রত্যাখানও করতে পারি না। তোমার এই পরিবর্তনের জন্য আমিও তো কিছুটা হলেও দায়ী। তাই অভিমান থাকলেও পরিবর্তনের চেষ্টা থাকলেও তোমাকে মানিয়ে নিয়েই চলছি। কিন্তু এভাবে মানিয়ে কতদিন চলতে পারব তা নিয়ে প্রশ্ন তো থাকছেই...

এই যেমন ধরা যাক কালবৈশাখী ঝড়। ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র দাবদাহ থেকে স্বস্তি দিতে প্রকৃতির পুরস্কার ছিল এই কালবৈশাখী। কিন্তু ক্রমশ তা হারিয়ে যাওয়াই শুধু নয়, হয়তো শিশুপাঠ্য থেকেও হারিয়ে যাবে বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। শুধু সকালে স্কুল বা অফিস যাওয়ার সময় রাস্তায় গাছ পড়ে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করে অন্য রাস্তা ধরে চলে যাবে। আগের রাতে এসি ঘরে ঘুমোতে ঘুমোতে সেই প্রজন্ম হয়তো টেরই পাবে না রাতে শহরের উপর দিয়ে কালবৈশাখী বয়ে গেছে। তাদের জীবনে অন্য ঝড় সামলাতে হয়, ফলে এই ঝড় সামলানো বা তা নিয়ে চিন্তা করার সময় থাকে না।

কিন্তু কেন এমনটা হল? কয়েক দশক আগেও শহরতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাঠঘাট, পুকুর, আমবাগান দেখা যেত। সূর্যের প্রখর তাপের কারণে স্থানীয় এই ঝড়ের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, স্থানীয়ভাবে কোনও এলাকার ভূ-পৃষ্ঠ অত্যধিক তাপমাত্রা অথবা অন্যান্য কারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং এই ঝড়ের জন্ম হয়। উত্তপ্ত, হালকা ও অস্থির বায়ু ঊর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে এবং সমতাপীয় সম্প্রসারণ (adiabatic expansion) প্রক্রিয়ায় বায়ুস্তর সম্পৃক্ত বিন্দুতে (saturation point) না পৌঁছনো পর্যন্ত শীতল হতে থাকে এবং কিউমুলাস মেঘ সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে কিউমুলাস মেঘ উল্লম্বভাবে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ গঠন করে এবং পরবর্তী সময়ে বজ্রঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় যা সবার কাছে 'কালবৈশাখী' নামে পরিচিত। সাধারণ বর্ষণের সঙ্গে এ ঝড়ের মূল পার্থক্য হচ্ছে, এ ঝড়ের সঙ্গে সবসময়ই বিদ্যুৎ চমকায় ও বজ্রপাত হয়। এটি একটি তাপগতিক (thermodynamic) প্রক্রিয়া যেখানে ঘনীভবনের সুপ্ত তাপ দ্রুত ঊর্ধ্বারোহী বায়ুস্রোতের গতিশক্তিতে (kinetic energy) রূপান্তরিত হয়। 'কাল' শব্দের অর্থ ঋতু (season), আবার কালো বর্ণকেও বোঝানো হয়ে থাকে। কালবৈশাখীকে কখনও কখনও 'কালোবৈশাখী' নামেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে যার অর্থ কালো বর্ণের বৈশাখী মেঘ। ঘন, কালো বর্ণের মেঘ ও ঝঞ্ঝা এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির জন্যই এ নামকরণ। ধ্বংসকারীকে 'কাল' বলেও ডাকা হয়। গ্রীষ্ম ঋতুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এ ঝড়ের আগমন ঘটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে না আছে বড় পুকুর, না আছে মাঠ না আছে আমবাগান। বদলে তৈরি হয়েছে কংক্রিটের জঙ্গল। ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের। এখন চৈত্র তো দূর... বৈশাখ পেরিয়ে গেলেও কালবৈশাখীর দেখা মেলে না। হাঁসফাঁস গরমে একটুও স্বস্তি মেলে না। জৈষ্ঠ্যের শেষে হাতে গোনা কয়েক দিন এই স্বস্তি পাওয়া যায়। তাও আবার জেলাগুলিতে কালবৈশাখীর ফলে অন্তত একরাতের স্বস্তি মিললেও কলকাতা শহরে কিন্তু তার প্রভাব কার্যত একরাশ অস্বস্তি নিয়ে আসে। কখনও ট্রেনের তার ছিঁড়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রী অসুবিধায় পড়েন। আবার মাঝরাতে রাস্তায় গাছ পড়ে থাকলে পরদিন কাজে বেরিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয় শহরবাসীকে। শহরবাসী তাই হয়তো এই ঝড় সামলাতে পারে না। তাদের গরম সামাল দেওয়ার জন্য এসি আছে। স্বস্তির বৃষ্টির দরকার পড়ে না। পারলে শহরে যে কটা গাছ আছে তাও কেটে ফেলে আবাসন বানাতে চায়। আর যত বেশি কংক্রিটের ভিড় বাড়ছে, গাছেরা ক্রমশই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যে কটা বড় গাছ শহরে আছে তাদের আশেপাশে এমনভাবে বাড়িঘর উঠেছে যাতে সেই গাছেদেরও প্রাণ সংশয় হচ্ছে তাই অল্প হাওয়াতেই উপরে পড়ছে শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব গাছগুলি। তাই শহরবাসী গরমে যতই কষ্ট পাক তাদের একাংশ কালবৈশাখী চায় না। ঝড়ের পর আমবাগানে আম কুড়াতে যাওয়া এখন শুধুই কল্পনা বা স্বপ্ন মাত্র। ঝড় মানে এখন আয়লা, লায়লার মতো বিধ্বংসী ঝড়গুলোকেই বোঝায়। ক্রমশ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়াই মূলত এইসব ঝড়ের উৎপত্তির কারণ। এছাড়াও জীবন মানেই এখন প্রতি মুহূর্তের ঝড়। অফিসে বসের টার্গেট সামলানো, নিউক্লিয়ার সংসারের নানা সমস্যা সামলানো বা স্কুল-কলেজ, কেরিয়ার সামলানো সবটাই এক একটা ঝড়। আর যদি এরপরও কোনও ঝড় সামলানোর ক্ষমতা থাকে তাহলে মোবাইলে গেম ডাউনলোড করলেই হল। কালবৈশাখীর কী দরকার! কালবৈশাখীর পর আমবাগানে আম কুড়োতে যাওয়ারই-বা কী দরকার!

তবে এই আধুনিক সমাজের বাইরেও এই সমাজের অনেক বাসিন্দা আছেন যাঁরা মনে প্রাণে একটু কালবৈশাখী চায়। সারাদিন পাবলিক বাসে যিনি কন্ডাকটরি করেন, সারাদিন রোদে পুড়ে, সাধারণ মানুষের মুখঝামটা শুনে ১২ ঘণ্টা ডিউটি করে ঘরে ফিরে একটু বিশ্রাম নিতে যাওয়ার সময় যখন বাড়িতে কারেন্ট চলে যায়, তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য তখন কালবৈশাখী। আবার সারাদিন মোট বয়ে রাতে মেসে ফিরে যে শ্রমিক ছোট্ট একটা ফ্যানের নীচে বসে ১০ জনের মধ্যে হাওয়া ভাগ করে খান তিনি একটু স্বস্তির জন্য কালবৈশাখীই খোঁজেন। শুধু মানুষই নয়, তীব্র গরম থেকে বাঁচতে পশুপাখিদের একমাত্র ভরসা একটু বৃষ্টি। তবে ঝড় আবার পাখিদের কাছে কাম্য নয়। কারণ গাছ ভেঙে পড়লে তারা গৃহহারা হয়ে পড়ে। তাই প্রকৃতির এই অবদান ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আধুনিকতার স্বার্থে আমরা তা নিজেরাই ধ্বংস করছি। যার ফলে বাড়ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। সব মিলিয়ে সচেতনতা এখন থেকেই তৈরি করতে না পারলে এক ভয়ংকর পরিণামের জন্য অপেক্ষা করাই এখন আমাদের কাজ।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৮ মে ২০১৭

# কবিগান থেকে বিশ্বকবির গান

**ঝুমা দাস মল্লিক**

‘কলকাতা তুমিও হেঁটে দেখো, কলকাতা তুমিও ভেবে দেখো ...’ —সমারোহপূর্ণ এই আহ্বান বড়ই চিত্তাকর্ষক। আচ্ছা, কেমন ছিল সেই কলকাতার গানবাজনার অবস্থা? কেমন করে কলকাতার আকাশ-বাতাস ভেসে গেল কবিগান থেকে বিশ্বকবির গানে? সেকথা জানতেই ফিরে যেতে হবে শুরুর দিনগুলোতে...

বিদেশি শাসকের ঔপনিবেশিক প্রয়োজন ছিল কলকাতা নির্মাণের পশ্চাৎপট। তাই সেই আদি কলকাতার ছিল না কোনও বিদ্যাচর্চা বা শিল্পচর্চার ইতিহাস বা আগ্রহ। ১৭৭০ সালে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি দশ-বারো হাজার। ১৭৯০ সাল নাগাদ সেটা চার লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছয়। বোঝা যায় জীবিকার টানে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হচ্ছিল। চাষি, জেলে, ময়রা, নাপিত, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী সবাই রুজির টানে কলকাতায় এসে ভিড় করছিল। তাদের সংস্কৃতি ও পূজাপার্বণের অনুষ্ঠানের গ্রামীণ স্মৃতিটুকুতে সমুজ্জ্বল ছিল অন্তর। তাই যাত্রা, পাঁচালি, চড়ক, কৃষ্ণলীলা, এই সমস্ত অনুষ্ঠানে মুখরিত ছিল কলকাতা। তবে ধনী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিবোধের খুব একটা ফারাক ছিল না। কারণ গোবিন্দরাম মিত্র, বনমালী সরকার, উমিচাঁদ, হুজরিমলের মতো ধনীরা অর্থে বিত্ত হলেও সংস্কৃতির মানসিক আভিজাত্য সেভাবে তাদের ছিল না। তাই রুচিহীন চড়া দাগের বিনোদন সাধারণের মতোই ধনীদেরও উপভোগ্য ছিল। সেই কলকাতা তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রমোদ-বিনোদনের নতুন নতুন মাধ্যম।

ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের সূচনায় নদিয়ার শান্তিপুরে আখড়াই গানের উদ্ভব হয়। সংগীত ও মার্জিত ভূমিকায় সমৃদ্ধ আখড়াই গান নিধুবাবুর মামা কুলুইচন্দ্র সেনের হাতে উৎকর্ষ পায়। তাঁর পোস্টে ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। এই গানে শাস্ত্রীয় সুর ও তালের সংযোগ ঘটেছিল। অবশ্য বিশুদ্ধ ধ্রুপদ চর্চা তখন কলকাতায় ছিল না।

১৭১২ সাল নাগাদ বিষ্ণুপুরে রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের সময়ে ধ্রুপদচর্চা উৎকর্ষ পায়। বাংলা গানে এর প্রবেশ ঘটে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীতকে আশ্রয় করে। খেয়াল ও ঠুংরির প্রবেশ আরও পরে। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে নবাব ওয়াজেদ আলি মেটিয়াবুরুজে যখন তাঁর বন্দিজীবন অতিবাহিত করছিলেন, তখন কলাবিদদের হাত ধরে খেয়াল-ঠুংরির প্রবেশ ঘটে কলকাতায়।

কিন্তু এরও আগে হুগলির রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু পঞ্জাবি দ্রুতলয়ের টপ্পা ভেঙে বাংলা প্রেমগীতি রচনা করেন। তিনি ছিলেন আখড়াই গানের গায়ক ও সমঝদার। ১৮০৫ সালে তিনি কলকাতায় দুটি আখড়াই গানের শখের দল গড়ে তোলেন। ক্রমে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আখড়াই গানের তিনটি বিষয় ছিল— ভবানী বিষয়ক, খেউড় ও প্রভাতী। এ গান মূলত সুরনির্ভর। ১৮০৬ সালে ‘সাজের বাজনা’ অর্থাৎ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রযোগে আখড়াই গানের মজলিশ জনপ্রিয়তা পায়। দিল্লি ও লখনউ ঘরানার খেয়াল টপ-খেয়ালকে বাংলা গানের আঙিনায় নিয়ে আসেন গুপ্তিপাড়ার কালীমির্জা চট্টোপাধ্যায়।

এই সমস্ত চর্চার পাশাপাশি সাতের দশকের শেষভাগে নদিয়া আর হুগলিতে কবিগানের উদ্ভব ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে কবিগান প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে কলকাতায়। বন্দনা, সখী-সংবাদ, বিরহ ও খেউড় কবিগানের এই চারটি ভাগ তার শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত। তবে কবিগানের মূল উপাদান ছিল স্থূল রুচি, লঘু ভাষাজ্ঞান ও অশালীনতা। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে নিমিত্তমাত্র করে এরা সাধারণ মানব-মানবীর লীলাগান রচনা করত। এমনকী গানের মধ্যে দিয়ে কবিরা ধনী পৃষ্ঠপোষকেরও সমালোচনা করতে রুচির সীমা ছাড়িয়ে যেত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি প্রতি বছর দুর্গাপুজোর নবমীর দিন পুত্র-পৌত্র সহযোগে কাদা খেউড় শুনতেন। অশ্লীলতার চরম নমুনা এই কাদা-খেউড়ে নাকি প্রত্যেককে অশ্লীল গান বাঁধতে হতো। রাজা নবকৃষ্ণ দেবও অনেক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে বসে খেউড় ও লহর শুনতেন। লহর ছিল খেউড়ের শহুরে সংস্করণ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশে বিদ্যার কণ্ঠে শোনা যায় ‘নদে শান্তিপুর হৈতে’ খেউড় আনাবার প্রস্তাব। দুই কবির দলের এই পাল্লা লড়াইয়ে কবিকে রীতিমতো দক্ষ হতে হতো। কারণ গানের কথা ও সুর তাৎক্ষনিক রচনা করে পেশ করাটা বেশ দক্ষতার বিষয়। গোজলা গুই, হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসুরা এ ব্যাপারে বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় দিতেন। তবে কবিগান ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনোরঞ্জন করতে পারেনি। তাই হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর বৃদ্ধির পাশাপাশি কবিগানও লুপ্ত হতে থাকে। ১৮৫০ সাল নাগাদ আর কোনও কবিগান সভার খবর পাওয়া যায় না।

তবে ভবিষ্যৎ বাংলা গানের বাণীপ্রাধান্য যেন কবিগানের মধ্যে দিয়েই সূচিত হয়েছিল। ভারতীয় রাগসংগীত সুরপ্রধান। কথা সেখানে সুরের দাসত্ব করে মাত্র। বাংলা গানের ক্ষেত্রে কথা আর সুর হাত ধরাধরি করে চলে। সেযুগে বাঙালির রঙ্গ-ব্যাঙ্গ-তামাশা এই সমস্ত আদি-রসাত্মক গানগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হলেও সেখানে ফুটে উঠেছিল নাটকীয়তা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রূপচাঁদ পক্ষীর কথা। জন্ম ১৮১৫ কিংবা ১৮১৮ সালে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংগীতে ওস্তাদী শিক্ষায় শিক্ষিত রূপচাঁদ পড়েছিল গাঁজাখোর পক্ষীদলের পাল্লায়। কলকাতায় তখন গজিয়ে উঠেছিল অনেক পক্ষীর দল। এরা ধনীগৃহের সন্তানদের উড়তে শেখাত। হুতোম এদের সুন্দর বর্ণনা রেখেছেন। যাই হোক রূপচাঁদ গান রচনা ও সুরপ্রয়োগে পটু ছিলেন। তাঁর রঙ্গ-ব্যাঙ্গমূলক গানগুলো বেশ মজাদার। মনে পড়ে তাঁর রচিত, ‘লেট মি গো ওহে দ্বারী/আই ভিজিট টু বংশীধারী’ কিংবা ‘আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম’ ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আর একটি বিষয়। ১৮৪০ সাল, বউবাজারে রাধামোহন সরকারের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালার মহড়া চলছে। পাশের গলি দিয়ে চলেছে কলা বিক্রেতা— ‘চা-ই চাঁপাকলা...।’ শুনে চেঁচিয়ে উঠলেন বিশ্বনাথ মতিলাল। ‘কে আছিস রে; গান্ধার বলছে রে, চাঁপাকলাকে ধরে আন।’ মজলিসের স্বরযন্ত্রের সুরের অনুবাদী হয়ে ধ্বনিত হয়েছিল চাই ‘চাঁপাকলা’— গান্ধার সুরে। তারপর তো ইতিহাস। বাবুদের আনুকূল্যে ফেরিওয়ালা গোপালের ওস্তাদি শিক্ষা শুরু হল। সৃষ্টি হলেন বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনেতা বিখ্যাত গোপাল উড়ে। কলকাতা এভাবে শিল্পী তৈরি করতেও জানতো।

কবিগান, আখড়াই তারপর মোহনচাঁদ বসুর হাফ-আখড়াই পেরিয়ে বাংলা গান এগোচ্ছিল তার নিজস্ব গতিতে। এই পথে মহিলারাও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বোষ্টমী, মালিনী বা নাপিতিনীরা অন্তঃপুরিকাদের কাছে পৌঁছে দিতেন বটতলার বই- এর পাশাপাশি সংগীতের সুর। ঢপ কীর্তন, পাঁচালি, কৃষ্ণলীলা সব গানই সেখানে প্রধান্য পেত। তবে মহিলারা ঢপ কীর্তনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ১৮২৬, ১১ মার্চ সমাচার দর্পণে পাওয়া যাচ্ছে গোলকমনি, দয়ামনি, রত্নমনি নামে তিন নেড়িকবির দলের নাম। এছাড়াও ছিলেন ঢপকীর্তনের জগন্মোহিনী, রাম বসুর দলের বাঁধনদার যজ্ঞেশ্বরীর মতো অনেকে। নগরায়ণের হাত ধরেই আসে পতিতালয়। ১৮৫৩ সালে যেখানে কলকাতার পতিতার সংখ্যা ১২,৪১৯; ১৮৬৭-তে তা বেড়ে হয় ৩০,০০০। এই পতিতাদের বেশ্যাসংগীত কিন্তু সেযুগের সংগীতের আরও একটি ধারা।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির পরিবর্তিত রুচি, ব্রহ্মসমাজের উত্থান, বাংলা নাট্যজগতে গানের প্রবর্তন— সব মিলিয়ে বাংলা গান এক অন্যতর পথে বাঁক নিল। পাথুরিয়াঘাটায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ খুঁজছিলেন বাংলা গানের নতুন পথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রথম আকারমাত্রিক স্বরলিপি সূত্রপাত করেন। ব্যবস্থাটা আরও আগে থাকলে তো অসংখ্য গান শুধুমাত্র খাতার পাতায় থেকে যেত না! যাই হোক, ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোর গৎ ভেঙে সুর রচনা করলেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপির সুচারু নির্মাণ হল। নবনাটকের অভিনয়ের মঞ্চে অর্কেস্ট্রা ব্যবহৃত হল। ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক ঐতিহ্য দ্বারকানাথের আমল থেকেই প্রবহমান। দ্বারকানাথ ছিলেন পারসি গজল, হিন্দুস্তানি সংগীত, ইতালীয়, ফারসি সংগীতে পারদর্শী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমঝদার ছিলেন এবং কালোয়াতি গানের তালিমও নিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ, বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ সংগীত বিশারদের সান্নিধ্য ঠাকুরবাড়ির একটি চোদ্দো বছরের ছেলেকে দিয়ে তার প্রথম গানটি লিখিয়ে নিল। তৈরি হল নতুন এক ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা। সময়টা ১৮৭৫ সাল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, ‘রবি আমাদের বাংলাদেশের বুলবুল।’ সংগীত রচনার শিক্ষানবিশিতে রবীন্দ্রনাথ পাশে পেয়েছিলেন তাঁর জ্যোতিদাদাকে। ‘সংগীতচিন্তা’ বইতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে কথা বসানোর মধ্য দিয়েই তাঁর গান বাঁধবার শিক্ষানবিশীর সূচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ ও ‘পুরুবিক্রম’ নাটকে রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি গান যথাক্রমে ‘জ্বলজ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ এবং ‘একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন’ ব্যবহৃত হয়। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গানের সংখ্যা দু’ হাজারেরও বেশি। তাঁর গানে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ঘরানা প্রধানত বিষ্ণুপুরী ধারার অনুসারী। তবে সেখানে শাস্ত্রীয় নিয়ম তিনি সর্বদা মানেননি। তাই অনেক গানে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইয়ের সঙ্গে সঞ্চারী ও আভোগকেও যুক্ত করেছেন। তাঁর ভাঙা গানগুলির অনেকটাই ধ্রুপদ গান ভেঙে তৈরি। খেয়ালাঙ্গ গানগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একাধিক রাগমিশ্রণে রচিত হয়েছে তাঁর অনেক গান। টপ্পা, ঠুংরির ধারাতেও তিনি গান রচনা করেছেন। পাশাপাশি বাংলার নিজস্ব বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তনের আঙ্গিকেও রচনা করেছেন অনেক গান। আবার তালের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সৃজনশীল। তাঁর গানগুলি প্রকৃতি, প্রেম, বিচিত্র, স্বদেশ, পূজা পর্যায়ে বিভক্ত। অবশ্য অনেক গানই কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়কে পেরিয়ে অন্যপর্যায়ে অন্তরভুক্ত করা যায়। ‘পূজা ও প্রেম’ পর্যায়ের ক্ষেত্রে কথাটি খুবই সত্য। আসলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— ‘যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।’

রবীন্দ্রনাথের গানগুলি একত্র করে বিভিন্ন সময়ে বই প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি স্বরলিপির জন্য রয়েছে স্বরবিতান। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন তাঁর অন্য সমস্ত সৃষ্টি কালের গতিতে নষ্ট হলেও বেঁচে থাকবে তাঁর গান। সেই গানের সুরের প্রতি তাঁর মমত্ব ছিল

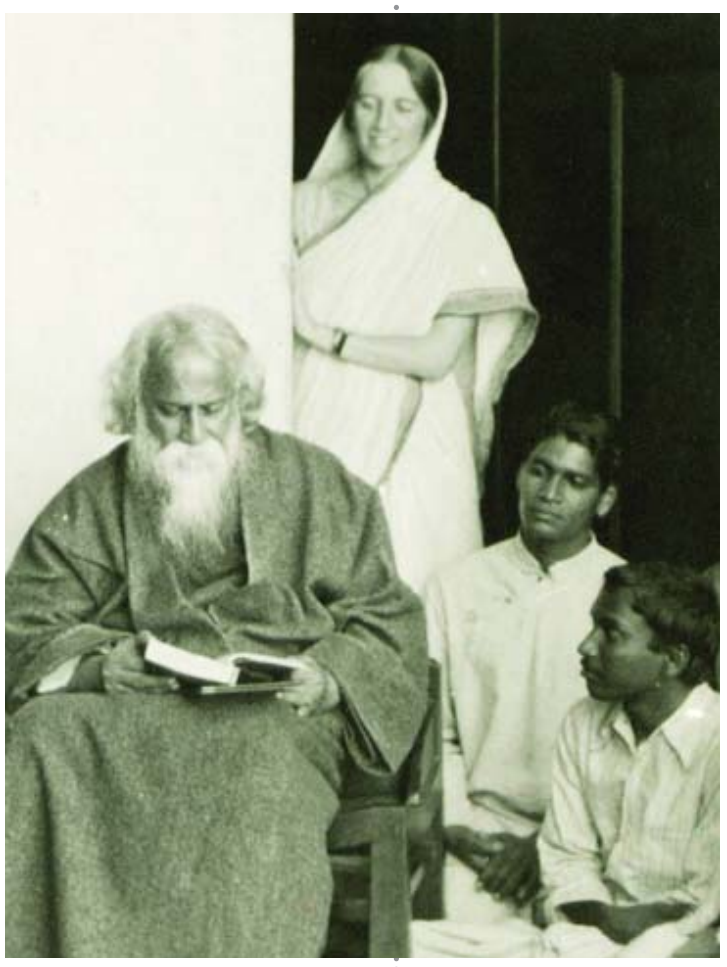

সমধিক। তিনি বারেবারে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ করেছেন, তাঁর গানের সুরের প্রতি গায়কের নিষ্ঠা তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত। সময়ের গতিতে বিশ্বভারতী হারিয়েছে তাঁর স্বত্ব। আজ রবীন্দ্রসংগীত যে কোনও কারও কাছেই সহজে লভ্য। তাই চলছে বিভিন্ন রাজ্যে যন্ত্র সহযোগে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এটা একদিকে ভালোই। সমস্ত ভালোকেই তো কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হতে হয়। যে গান মানুষের সমস্ত অনুভূতির, সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা রাখে সে তার স্বাতন্ত্র নিয়েই বেঁচে থাকবে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৮ মে ২০১৭

**প্রিয় 'যুগশঙ্খ সাপ্লি'র পাঠক আপনারা ওয়েবসাইটের 'রিডার্স কমেন্ট'-এ কিংবা ই-মেইলে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত লিখে জানাচ্ছেন। আমরা ভীষণ খুশি। আমরা আপনাদের মতামত থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছি এবং আপনাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। আপনাদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, আপনারা যাঁরা 'সাপ্লি' সংক্রান্ত মতামত জানাচ্ছেন,তাঁরা দয়া করে ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানাবেন। কারণ, আমরা আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতে চাই।** *(সাপ্লি টিম)*

বেতার @ কলকাতা

# কবিগুরুর বীণাপাণি

**মনীষা ভট্টাচার্য**

**পর্ব : পাঁচ**

গুড মর্নিং। সকাল হয়ে গেছে, উঠে পড়ুন। উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখুন বাইরে একটা হলুদ রাঙা রোদ উঠেছে। কাঁচা হলুদ রঙের রোদ। এই রোদের তেজ নেই। আছে মনোরম আলো। আলোয় আলোয় মুক্তি। সেই মুক্তিতেই আনন্দ। তাই বলি কী উঠে পড়ুন। সঙ্গে আছি আমি, আর আছেন রবি ঠাকুর। 'ও জোনাকী কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ...' কলকাতার এক বিখ্যাত এফএম স্টেশনের জনপ্রিয় আর জে শুরু করলেন তাঁর সকালের শো। ব্যাক টু ব্যাক তিনটি রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে সে আবার ফিরে আসবে। এইভাবেই রবি ঠাকুরের হাত ধরে বর্তমান কলকাতার সকাল শুরু হয়। যখন এত এফএম স্টেশন ছিল না, তখনও রেডিওতে ছিল রবীন্দ্রসংগীত। আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্কের কথা 'কবিগুরুর বীণাপাণি' শীর্ষক আগের পর্বগুলিতে বলেছি। আজ বলব বাকিটুকু। আকাশবাণী কলকাতার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান হল 'সংগীত শিক্ষার আসর'। শুরু হয়েছিল ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিতে গেলে তিনি বলেন, সংগীত শিক্ষার আসরে তাঁর গান শেখানো যেতেই পারে, তাতে তাঁর আপত্তির কোনও কারণ নেই, বরং আনন্দই পাবেন। তবে গানের সঙ্গে তবলার ব্যবহার যেন মৃদু হয়। সেই শুরু, তারপর দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি চলেছে।

একবার রবীন্দ্রনাথ বেতারের জন্য ইংরেজিতে তিনটি বক্তৃতা রেকর্ড করবার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনটি বক্তৃতা লেখা সম্পন্ন হলে গুরুদেবের সেক্রেটারি জানালেন অশোককুমার সেনকে। ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে মি. সেন এলেন শান্তিনিকেতনে। রেকর্ড সম্পন্ন হল। সেবার অশোকবাবু কবির কাছ থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের রেকর্ডিং করার সম্মতিও আদায় করে নিয়ে যান। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কবি দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালিনী এবং অর্জুনের ভূমিকায় নন্দলাল বসুর পুত্রবধূ। অশোকবাবু যতবার শান্তিনিকেতনে গেছেন ততবারই তিনি সার্থক হয়েছেন। একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এবং তাঁর নির্দেশে অমলা বসু, ইন্দ্রলেখা ঘোষ ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেন কলকাতা বেতারের জন্য। সেই সঙ্গে ছিল প্রায় ত্রিশজন পুরুষ ও নারীর মিলিত কণ্ঠে গাওয়া 'নীল আকাশের কোণে কোণে' ও 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান দুটিও। অশোকবাবুর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় গুরুদেব নিখুঁত কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। তৃতীয়বারের রেকর্ডিং শুনে তবে কবি তৃপ্ত হয়েছিলেন।

এবার বলি ১৯৩৯ সালের একটি ঘটনা। কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ভারত থেকে কোনও এক জাদুকরের ইন্টারভিউ চেয়ে পাঠান। ফিলডেন (স্টেশন ডিরেক্টর) এই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁদের কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতির কথা জানান। পাশাপাশি অশোককুমার সেনকে বলেন কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের কাছে যেন অল ইন্ডিয়া রেডিওর মুখরক্ষা হয়। অশোককুমার সেন আবার গেলেন শান্তিনিকেতন। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে, সংক্ষুব্ধ বিশ্বে কানাডার কী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে বাংলায় একটি কবিতা লিখে রেকর্ড করাবেন কবিকে দিয়ে। অশোকবাবুর অনুরোধে কবি প্রথম ত্রিশ সেকেন্ডে বাংলায় ও পরে সেই বাংলা কবিতার ইংরেজি তর্জমা করে সেটিও পাঠ করতে রাজি হলেন। এজন্য ফিলডেন সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করে অশোকবাবু বলেন, কানাডা ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন যেন বিশ্বভারতীকে ১০০০ টাকা প্রদান করে। সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে টাকা এসে পৌঁছয় বিশ্বভারতীতে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এক জায়গায় লিখছেন, হঠাৎ একদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে খবর এল জোড়াসাঁকোতে স্টেজ বেঁধে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। খবর পেয়েই বীরেনবাবু ছুটলেন জোড়াসাঁকোতে। নাটকটির সরাসরি রিলে করে বেতারে সম্প্রচারের অনুমতি চাইলে খুব খুশি হয়ে কবি তা দিয়েও দিলেন। কবি অভিনয় করেছিলেন রাজার ভূমিকায়। তাঁর বাচনভঙ্গি, অভিনয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার। শ্রোতারা শুনে মুগ্ধ। টেলিফোনে, চিঠিতে সেই মুগ্ধতার কথা বারবার প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন।

রবীন্দ্রনাথ যখন যেখানে থেকেছেন সেখানেই পৌঁছে গেছে কলকাতা বেতার। তখন কবি মংপুতে। নিয়মিত শোনেন সংবাদ। কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, 'তোমার কর্তৃপক্ষকে (স্বামী) ডাকো, রেডিওটা চালান, একটু শোনা যাক কটা জাহাজ ডুবল। যে লোকটা বাংলায় বলে, বলে কিন্তু বেশ।' অন্য একদিনের কথা, সেদিন ২৫ বৈশাখ। মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী রবীন্দ্রনাথকে বললেন ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে বিশেষ প্রোগ্রাম কলকাতা বেতারে এক্ষুনি শোনা যাবে। এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়ে রেডিওর খুব কাছে গিয়ে বসলেন। একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল। সেই পাঠ শুনে কবির মন্তব্য, 'আজকাল বাংলা ভাষার বেশ উন্নতি হয়েছে। অনেকেই মোটামুটি লেখে ভালো। তবে এর অর্ধেকের ওপরই তো আমার কোটেশন, রবি ঠাকুরের লেখা বললেও চলে।' অন্য একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন, 'ইউরোপীয় সংগীত শুনছিলুম গো আর্গে, কী আশ্চর্য যন্ত্রটা। কোন সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি।'

যত দিন গেছে কবি ততই আশ্চর্য হয়েছেন এই যন্ত্র সম্পর্কে। ভেবেছেন কীভাবে দূর দেশের কথা এদেশে চলে আসে! যাই হোক ১৯৪১ সালে কবি যখন খুব অসুস্থ হলেন, জুলাই মাসে যখন কলকাতায় এলেন, অপারেশন হল, সেই সময় কবি কেমন

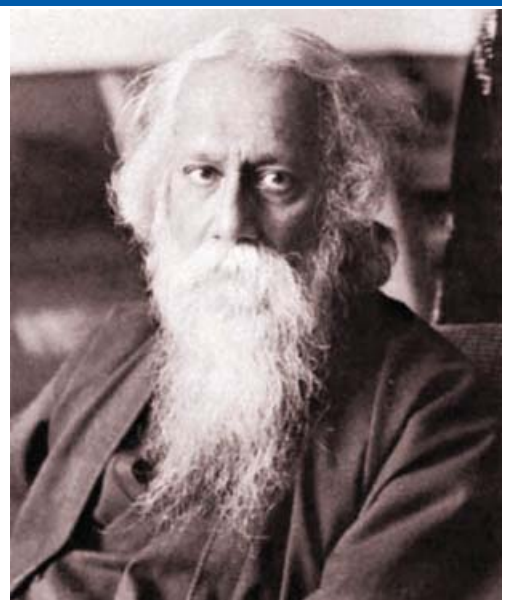

আছেন, প্রতি ঘণ্টায় তার খবর জানাতে কলকাতা বেতার তৎপর হল। দায়িত্ব পেলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ৬ আগস্ট ঘণ্টায় ঘণ্টায় কবির স্বাস্থ্যের সংবাদ শ্রোতাদের কাছে ঘোষণা করা হতে লাগল। অবশেষে ২২ শ্রাবণ মধ্যাহ্নে 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস জোড়াসাঁকো থেকে সবার প্রথম খবর দিলেন বেতারকে কবি প্রয়াত। এরপর কবির শবদেহ জোড়াসাঁকো থেকে নিমতলা মহাশ্মশানের অনুগমন করতে থাকে কলকাতা বেতার। তিল ধারনের জায়গা নেই। একটি মই সংগ্রহ করে শ্মশান ঘাটের চূড়ায় উঠে মাইক্রোফোনে রেকর্ড করতে থাকেন বীরেনবাবু রবীন্দ্র শেষকৃত্যের সংবাদ। দুঃখের বিষয় সেই রেকর্ডিং সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব হয়নি। এখানেই শেষ নয়, এই বেতারেই কবি নজরুল পড়লেন রবীন্দ্র প্রয়াণে তাঁর লেখা 'রবিহারা' কবিতা। শোনা যায় সেই কবিতা পাঠ করতে করতে কবিকণ্ঠ কান্নায় বুজে এসেছিল। চিত্রগ্রাহক পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় সেদিনের সেই মুহূর্তের কথা। '...কী বিপুল বিষণ্ণতা আর শোক বিহ্বলতা বাংলার বুকে।...যখন তাঁর সত্য মৃত্যু ঘটল, তখন চিন্তা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। রেডিওতে খবর, চোখে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। ...তারপর রাত্রে আবাবও রেডিও, শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা। সুনীল রায়ের কণ্ঠে গান শুনছি, ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার, সমুখে শান্তিপারাবার।'

সেই শান্তির মাঝেই রবি ঠাকুর আছেন আজও। আজও কলকাতা বেতার তাঁর গানকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। শুধু তো রবি ঠাকুর নন, কলকাতা বেতারের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আকাশবাণীর আগামী পর্বে তাঁর কথা। আসলে বাংলা সাহিত্যে দুজনের নাম যে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাই কয়েনের এপিঠের কথা বললে অন্যপিঠ বাদ দিই কেমন করে।

চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

# পথে পথে রাজার বাড়ি

**পান্থজন**

অনেকদিন ধরে একভাবে চলছি আর পথের দু'ধারের নানা ইতিহাস আর অজানা কথা জানিয়ে চলেছি। পাঠকেরা ক্লান্তি বোধ করছেন? আমি কিন্তু ক্লান্ত হইনি, কারণ যত চলছি আর দেখছি, ততই অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ হচ্ছি। অতীতে এই পথে কতবার গিয়েছি, কিন্তু বেশিরভাগটাই থেকে গেছে অজানা। অতীতের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে জেগে উঠল উড়ালপুল ভেঙে পড়ার দুঃখস্মৃতি। আপাতত সবকিছুকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার পালা। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতেই আমার ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে লোহিয়া হাসপাতাল। হঠাৎ দেখলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ভেবে ভ্রম হতে পারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল অতীতে এই বিরাট প্রাসাদের মালিক ছিলেন হরেন শীল। উত্তর কলকাতার সম্ভ্রান্ত বনেদিবাড়ির অন্যতম ছিল এটি। কালের নিয়মে হাতবদল হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বিরাট অট্টালিকার মালিক হন কানাইলালজি লোহিয়া। তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। সেই কারণে তিনি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তিটির ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাই নন্দলালজি লোহিয়ার পুত্র কিষানলাল লোহিয়া বর্তমানে এখানকার চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনা করেন। এই বাড়িতেই একসময় ছিল লোহিয়া মাতৃসেবা সদন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উত্তর কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ

চিকিৎসালয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এর ঠিক বিপরীতেই রয়েছে মল্লিকদের বাড়ি। বাড়িটি যে প্রাচীন সে বিষয়ে গৌরচন্দ্রিকা নিষ্প্রয়োজন। অনেক চেষ্টা করেও বাড়ির বর্তমান শরিকদের কাউকেই পাওয়া গেল না। এর আশপাশে আছে ছোট-বড় মাঝারি চা বিক্রেতাদের দোকান। নানান স্বাদের নানান দামের চায়ের পাতা মিলবে এই চত্বরে। চা-পানে আসক্ত ব্যক্তিরা সময়-সুযোগ করে চলে আসতে পারেন চিৎপুর রোডের এই অংশে। লোহিয়া হাসপাতালের ঠিক পাশেই জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে কলকাতার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা কে সি দাশের প্রথম বিপণন কেন্দ্র। আগাছার মাঝে উঁকি দিচ্ছে সিমেন্টের তৈরি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা দোকানের নাম। এছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দোকান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৩০ সালের কিছু আগে।

একটু পিছিয়ে এসে ঢুকে পড়ি ফেলে আসা জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে। দুপুরের নিস্তব্ধ পরিবেশে রাজবাটী চত্বরের ভিতর কাউকেই পাওয়া গেল না। সদরের সামনে ফোয়ারা আজ পড়ে রয়েছে শুষ্ক অবস্থায়। অনেক চেষ্টা করে এক শরিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর পাওয়া গেল। তাঁর কন্যা সুস্মিতা সেনের কাছে জানা গেল অতীতের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস। মহারাজা সুখময় রায়বাহাদুর এই অট্টালিকা তৈরি করেন। এক সময় এই পরিবারের পদবি ছিল ধর। সুখময় রায়বাহাদুর তাঁর দানধ্যানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কাশীপুর গান ফাউন্ড্রি ঘাট এবং সংলগ্ন দমদম রোড নির্মাণের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কলকাতার অন্যতম ফরগটন প্যালেস জোড়াসাঁকো রাজবাটী আজ যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তা নয়, বরং তার রক্ষণাবেক্ষণ চোখে পরার মতো। পরিবারের বর্তমান সদস্যরা জানালেন অনেকদিন ধরে এখানে ছবির শুটিংয়ের কাজ চলে। ভেঙ্কটেশ ফিল্মস কোম্পানিও এখানে একাধিক ছবির কাজ করেছে ইতিমধ্যেই। তাদের সৌজন্যে বাড়িটির বিভিন্ন অংশ নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। আজ আর এখানে কোনও পুজোপার্বণ হয় না। বাড়ির সদস্যসংখ্যা কমতে কমতে এখন পাঁচ থেকে ছজনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজবাড়ির প্রধান ফটক থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই রবীন্দ্রকানন আর সেই অঞ্চলের দু'পাশে রয়েছে পশ্চিমবাংলার সব যাত্রা কোম্পানির অফিস। যাত্রার ইতিকথা শোনানো যাবে সামনের দিন।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৮ মে ২০১৭

যুক্তি-তর্ক-আড্ডা @ কলকাতা

# রিমিক্সের আওতায় রবীন্দ্রসংগীত

**তন্ময় মণ্ডল**

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কাছে এক অন্য অনুভব। এক আবহমান সংস্কৃতির রূপরেখা। আসলে তাঁকে কোনও গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ মানে এক অপার পৃথিবী। যেখানে আদিগন্ত বিস্তৃত তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সর্বোপরি তাঁর গান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তাঁর সেরা সৃষ্টি তাঁর গান। শুধু গানের একক স্পর্ধায় ছাপিয়ে গেছেন অন্যান্য সৃষ্টিকে। সংগীত সৃষ্টিতে যে আনন্দ তিনি পেতেন তেমন বোধহয় আর কিছুতে নয়। তাই হয়তো 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারির যাত্রী' অংশে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর এই গীতসর্বস্বতার কথা অকপটে তিনি লিখে গেছেন। কবি লিখেছেন, '... গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড় বড় দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।' সৃষ্টিশীলতার পরতে পরতে গানের মাধুর্যে জগৎকে দেখার যে আনন্দ তা তাঁর কথায় এবং গানে স্পষ্ট। ঈশ্বর, মানুষ, প্রকৃতি নিয়ে তাঁর গানে যে নিবিড় সৌন্দর্যের ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা চিরবিস্ময়। তিনি গানের ভেতর দিয়ে আমাদের চিনিয়েছেন জীবন ও জগতের রূপরহস্য। তাঁর গানের জাদুস্পর্শ মুহূর্তকে ভরিয়ে দিতে পারে অনির্বচনীয়তায়। রবীন্দ্রসংগীত শব্দটির মধ্যে অভাবিত এক বিস্ময় লুকিয়ে আছে। বিস্ময় এই ভেবে, এ-গান এমনই এক সৃষ্টি, যা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে অপার্থিব আনন্দে প্রাণ-মন ভরে ওঠে।

সময়ের সাথে সাথে পালটে গেছে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ধরন। পালটে গেছে গানে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র। সংগীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো চিরকালীন। তবে কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর বা রিমিক্সের আওতায় এসে কোথাও কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না রবীন্দ্রসংগীতের সেই মেদুরতা, সেই অনন্ত অনুভব? নাকি আদতে রবীন্দ্রসংগীতের এই পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল? এই প্রেজেন্টেশন কি আদতে মুগ্ধ করতে পারছে শ্রোতাদের? সে বিষয় নিয়েই **আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডায়** সংগীত জগতের পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব...

**ইমন চক্রবর্তী**
(সংগীতশিল্পী)

রবীন্দ্রসংগীতের একটা বেসিক দিক আছে সেটাকে অবশ্যই মেনটেইন করা উচিত। সময়ের সাথে আমাদের যাপন বদলেছে সুতরাং প্রেজেন্টেশনটা সময়ের উপযোগী হওয়া দরকার, তবে তা কখনওই গানের মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করে নয়। গানের নোটেশন চেঞ্জ করাতে আমার আপত্তি আছে। টেকনিক্যালি আমরা আজকে অনেকটা এগিয়ে গেছি সুতরাং মিউজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টে নতুনত্ব আসুক কিন্তু সেটা যেন গানটাকে জাস্টিফাই করে। গানকে ওভারশ্যাডো করে এমন কোনওকিছুই কাম্য নয়।

**রাঘব চট্টোপাধ্যায়**
(সংগীতশিল্পী)

সব কিছুরই ভালো ও মন্দ দুটো দিক থাকে। কপিরাইট উঠে যাবার পর বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথের গানকে ব্যবহার করা হয়েছে। সিনেমার ক্ষেত্রে অনেকেই এটা খুব যোগ্যভাবে করেছেন। আবার অনেক স্বেচ্ছাচারিতাও হয়েছে। এর মধ্যেই আর একটা দিক হল নতুন জেনারেশনের কাছে রবীন্দ্রনাথকে নতুন ভাবে পৌঁছে দেওয়া। একটা সময় ছিল যখন মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্ররা তবলা-হারমোনিয়াম নিয়ে গান করতেন। সেই সময়ে ওটাই ছিল বেস্ট সাউন্ড। কিন্তু সেই যুগটা চলে গেছে এখন সেই গানটাই ওইভাবে গাইলে শ্রোতা বা দর্শককে বসিয়ে রাখা যাবে না। আমার নিজের রবীন্দ্রসংগীত অ্যালবামেই নতুন ধরনের সাউন্ড করেছিলাম যেটা সুপারহিট। কথা এবং সুর অক্ষুণ্ণ রেখে নতুনত্ব সবসময় প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

**কিংশুক চট্টোপাধ্যায়**
(গীতিকার)

না, খারাপ লাগছে না। বরং কিছু কিছু আগে শোনা গান, এখন আর আরও ভালো লাগছে নতুন করে শুনতে। তবে রবি ঠাকুরের গানের কথা তো কেউ বদলে দিচ্ছেন না বা তাঁর তৈরি করে যাওয়া স্বরলিপির বাইরেও কেউ যাচ্ছেন না। তাঁর গান, তাঁরই আছে। সেই সময় থেকে এই সময়, পার্থক্য তো প্রেম-প্রকৃতি বা আধ্যাত্মিকতায় কিছু ঘটেনি। বদল যা হয়েছে শুধু পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার। আর তার সঙ্গে বিকাশ ঘটেছে প্রযুক্তির। বেড়েছে জীবনের ব্যস্ততা। তাই যে কোনও গানের সঙ্গেই জড়িয়ে যাচ্ছে নানান আনুষঙ্গ। রবি ঠাকুররের গানও তার বাইরে নয়। তাঁর গানের শরীরেও জড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের এখনকার সময়ের মন। মগজ, চিন্তা, চেতনার স্রোত। নতুন নতুন ভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে তাঁর গানের ব্যবহার। যুক্ত হচ্ছে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। তৈরি হচ্ছে এক অন্য আবহ এবং তা তাঁর গানকে বিরক্ত না করেই।

**জয়তী চক্রবর্তী**
(সংগীতশিল্পী)

রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি মূল ব্যবহারিক দিক হল অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা এবং সিনেমা। সত্যজিৎ রায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অপর্ণা সেন থেকে এই সময়ের বহু চিত্র পরিচালক কথা এবং সুর অপরিবর্তিত রেখে রবীন্দ্রসংগীতকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। রবি ঠাকুরের গান যুগোপযোগী গান। সময়ের সাথে সাথে তার প্রকাশভঙ্গিটা বদলেছে। গিটার ভায়োলিন কি-বোর্ড সহযোগে নতুন অ্যারেঞ্জমেন্ট শুরু হয়েছে। এর পজেটিভ দিক হল ইয়ং-জেনারেশনকে ধরা গেছে। তারা শুনছে, তাদের ভালো লাগছে। বহু মেইনস্ট্রিম শিল্পী আজকে রবীন্দ্রসংগীত অ্যালবাম করার সাহস দেখাচ্ছেন, মঞ্চে গাইছেন। এটা অবশ্যই একটা ভালো দিক। রবীন্দ্রনাথের গান একটা বেসিক শিক্ষার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং সেই মানুষটার সৃষ্টি নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়। সেটা কোনওদিনই মানুষ গ্রহণ করবে না। রবীন্দ্রনাথের গানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাদেরকে মুক্তমনা হতে হবে, উদার হতে হবে। কিন্তু উদারতা মানে যথেচ্ছচার নয় স্বাধীনতার অপব্যবহার নয়।

**সৈকত ঘোষ**
(গীতিকার)

এই এভারগ্রিন মানুষটি তাঁর সময়ের থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে ছিলেন। চিন্তন এবং দর্শনগত দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা বেড়েছে বই কমেনি। সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদেরকে আপডেট করেছি। বদলেছে পছন্দের ফ্লেভার। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগে অ্যারেঞ্জমেন্টের এই পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক এবং সময়োপযোগী। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি করে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্রনাথ শুধু এলিট শ্রেণির জন্য এই মিথটা ভেঙে গেছে। আমার মনে হয় আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি আরও নতুন নতুন আঙ্গিকে এক্সপেরিমেন্ট করতেন।

রবিঠাকুর @ কলকাতা

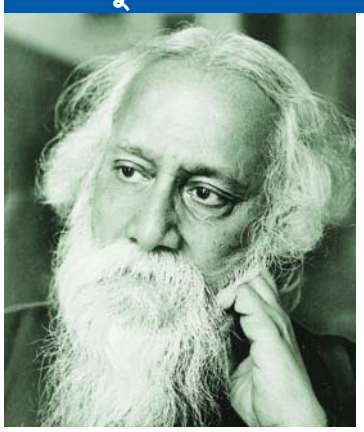

**নীহারিকা**

# ওয়াটার অব ইন্ডিয়া

ক্রিং ক্রিং।

'ইয়েস স্যার।'

'একটু রবীন্দ্রনাথকে পাঠান তো ঘরে।'

'আসব স্যার? ডাকছিলেন?'

'হুঁ। শোন, সামনে দাদুভাই জন্মাচ্ছেন। নতুন কিছু স্কুপ তৈরি করে নিয়ে এসো, যেখান থেকে পারো। উনি চাট্টি কবিতা লিখেছিলেন, গান বানিয়েছিলেন আর নোবেল পেয়েছিলেন— এই কচকচি অনেক হয়েছে। পুরনো লোকটাকে নিয়ে আজকের মতো কিছু তৈরি করো। মনে রেখো আমাদের দাদুভাই হলেন, ম্যাজিশিয়ানের ওয়াটার অব ইন্ডিয়া। আর হ্যাঁ শোনো, ইয়ং ক্রাউডের ওই আদিখ্যেতামার্কা উত্তর চাই না।'

হা হতোস্মি!

রবীন্দ্রনাথ স্যারের রুম থেকে মুখ কাচুমাচু করে বেরোলেন। কবিতা, গান, এসব কিছু লেখা যাবে না? তাহলে লিখবে কী? ঘটি বুঝি আবার ওল্টালো। চাকরিটা আর থাকবে না।

'এই রবীন্দ্রনাথ, 'সঙ্কোচের বিহ্বলতার' পরের লাইনটা কী যেন?'

'সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান'। সায়নকে লাইনটা বলেই রবীন্দ্রনাথ তরাক করে উঠে দাঁড়াল। বসের চ্যালেঞ্জটা নিতেই হবে। বেরিয়ে পড়ল সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের খবর জোগাড় করতে। বারে বারে কানে বাজতে লাগল 'পুরনো লোকটাকে নিয়ে আজকের মতো কিছু তৈরি করো।'

'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি, নাচিবি ঘিরিঘিরি গাহিবি গান-এর মানে বোঝ, সহচরী মানে বন্ধু। বন্ধুকে বলছে হাত ধরে ঘুরে ঘুরে নাচতে আর গান গাইতে। বুঝেছ? মানে বুঝে গাইবে। মনে রেখো, মানে বুঝে না গাইলে ঠাকুর রাগ করেন।' দাদার মেয়েকে গানের টিচার গান শেখাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ শুনছে পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে। আগত রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রস্তুতি চলছে। লোকটাকে নিয়ে নতুনভাবে কিছু করার প্রথম অভিজ্ঞতা শুরু হলো বাড়ি থেকেই। 'মানে বুঝে না গাইলে ঠাকুর রাগ করেন।' মুচকি হেসে রবীন্দ্রনাথ ঠিক করে ফেললেন আগামিকাল সে শহরে ঘুরবে। পরেরদিন একবারটি যাবে শান্তিনিকেতন।

সকাল ৯টা। ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থামলো বউদির চায়ের দোকানে। এখানে কেউ তাকে চেনেন না। দেখল দুই বুড়ো বসে রাজনৈতিক কড়চা কবচাচ্ছেন। একে অন্যকে দোষারোপ করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ওঁনারা থামলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?' রবীন্দ্রনাথ ভাবল, বস বলেছেন ইয়ং ক্রাউডের আদিখ্যেতা না লিখতে, কিন্তু এঁরা তো ইয়ং নন। 'চাই মানে, আমি রবীন্দ্রনাথ, আ...'। 'বোশেখ মাস পড়ল কী পড়ল না, অমনি শুরু হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। নতুন করে কী আর জানাবেন বলুনতো? তিনি বাঙালির, তিনি বিশ্বের। আমরা অবধি মেনেছি। বেচেছি। আজকের প্রজন্মও লুটে নিচ্ছে। তিনি আগে ছিলেন বইয়ের শো-কেসে। এখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সারা পশ্চিমবাংলায় উনিই তো আছেন ভবনে ও প্রস্তরে। আমরা তাঁকে কখনও সখনও চিঠিতে স্থান দিয়েছি। আজ তিনি কী যেন বলে, ওই ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে। এটা উন্নতি না অবনতি, বলতে পারব না। তবে উনি আছেন, থাকবেন, এটাও আশা করা যায়। আর কিছু বলার নেই।' দুই বুড়োর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই, একজনের ফোন বেজে উঠল। 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি...হ্যাঁলো...।'

এরপর সারাদিন ধরে নানা অভিজ্ঞতা।

'...মাইরি বলছি দাদা, উনি ভগবান। ওঁর কথা, ওঁর গানের লাইন আমাকে প্রতিক্ষেত্রে বাঁচিয়েছে।'

'বড্ড বেশি ফেনিয়েছেন প্রবন্ধগুলিতে। আরও কমপ্যাক্ট করতে পারতেন, সে ক্ষমতা ওঁর ছিল...।'

'জীবদ্দশায় যেটা ভীষণ জরুরি ছিল, গীতবিতানের পরিমার্জন।'

'আমি কী বলি বলুন তো? সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে মুড়ি মাখি, বিক্রি করি। কে রবীন্দ্রনাথ তা জেনে আমার কী লাভ বলুন?'

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত। তবু নানা মুনির নানা মত নিয়েই চলতে হবে। পরের দিন সকালে কু-ঝিক-ঝিক! শান্তিনিকেতন। সেখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। প্রায় সবার ভেতরেই একটা অবনত শ্রদ্ধা। যদিও মিষ্টির দোকান থেকে চাউমিনের দোকান সবকিছুতেই রবীন্দ্রনাথ বিরাজমান। রবিঠাকুর তাঁদের আপনার লোক। 'ও রবি ঠাকুর গো, তুকে এ বোশেখে গেরামে লিয়ে যাব, বোলেছিলেম তুকে ইকটা গান লিখিস কেনে আমার জইন্য। তু বোলেছিলি, লিখবি। লিখিস লাই। লাইছি তুকে মোর গেরামে। কাল তুর জনমদিন কিনা-এ বোশেখ মাসে, এ গরমে, তুর কষ্ট হয় না? মুখে কেমন সাদা সাদা চুলটো রাখিস, আচ্ছা বলদিকিনি বটে, তু লিখিস ক্যামনে?' শান্তিনিকেতনে তিনি আর নেই এ কথা বিশ্বাস করতে রবীন্দ্রনাথের কষ্ট হলো। সাঁওতাল মেয়েটির মধ্যে যে সারল্য তার কথা ভেবে সে অবাক হলো।

দু'দিনে যা বাজার হল, তা দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' নামক পদটি রান্না করা যায় কীভাবে ট্রেনে বসে যখন ভাবছেন, তখন পাশে বসে থাকা লোকটির বুকপকেট বলে উঠল, 'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।' রবীন্দ্রনাথ যেন দিশা পেলো। এবার তাঁর বুক পকেট বলছে, 'আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই...হ্যাঁলো'

'খুব তো সোনার হরিণ চাই-চাই করছ। দু'দিন অফিসে আসোনি। রবীন্দ্রনাথের খবর কী?' 'লেখা রেডি স্যার, কাল গিয়েই...' কু কু কু...।

বি.দ্র.— পরেরদিন রবীন্দ্রনাথ যে কপিটা জমা দিয়েছিলেন বসের টেবিলে, আমি সেই কপিটাই হুবহু টুকে দিলাম। আগামিকাল ২৫ বৈশাখ। ১৫৬ বছর আগে জন্মানো মানুষটার প্রতি রইল অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৮ মে ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।



# বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হল...

**রমাপ্রসাদ দেব** (রবীন্দ্র-গবেষক)

কলকাতা মানে প্রাসাদনগরী। কলকাতা মানে জোড়াসাঁকো। কলকাতা মানে রবি ঠাকুর। কলকাতা মানে এক স্বপ্নের শহর। কলকাতা আর আমার শহর ঢাকার মধ্যে আমি তেমন কিছু ফারাক খুঁজে পাই না। দুটোই আমার প্রাণের শহর। যেখানে অলিতে-গলিতে বঙ্গ-সংস্কৃতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। আর বাঙালি এমন এক জাতি যার কাছে সংস্কৃতি মানে এক অপার ভালোবাসা।

কলকাতা যাই প্রথমবার তাও প্রায় বছর পাঁচেক আগে। একটা সাহিত্যের অনুষ্ঠানে। এয়ারপোর্টে নামার পর গাড়িতে করে পার্ক স্ট্রিট যাওয়ার কথা। সন্ধের গায়ে তখন রাত্রির আভা পড়তে শুরু করেছে। শহরের ফ্লাইওভারগুলোতে দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন ওভারব্রিজ থেকে আলোর স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার বাইপাস ধরে আমরা সায়েন্স সিটি হয়ে তবে পার্ক স্ট্রিট যাব, এমনই ঠিক ছিল। যেতে যেতে বাইপাসের পাশে একটা ধাবায় আমি আর আমার বন্ধু প্রোফেসর সুজয় দে নাস্তা সারলাম। চুপচাপ বসে রাতের স্নিগ্ধ-শান্ত কলকাতাটাকে দেখছিলাম। সে এক অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ। কলকাতার সাথে এই আমার প্রথম দেখা। আমাদেরই এক বন্ধু নিলয় গুহর একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠান পরের দিন রবীন্দ্রসদনে। এই উপলক্ষেই আমার আসা।

পরেরদিন সকালে উঠলাম। পার্ক স্ট্রিটে তথা কলকাতায় এই প্রথম একটা রাত কাটল আমার। সকাল সকাল সুজয় চলে এসেছিল আমার হোটেলে। সেখানেই সকালের নাস্তা সারার পর ঠিক করলাম যেহেতু বিকেলে অনুষ্ঠান তাই সকালের একবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িটা দেখে আসা যেতেই পারে। বেরিয়ে পড়লাম দুই বন্ধু মিলে। সে এক অদ্ভুত আনন্দ কাজ করছিল, আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি, যেখানে কবিগুরুর জীবন-কবিগুরুর পরিবার-পরিজন, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মনের ভেতর তীব্র উৎফুল্লতা নিয়েই গিরিশ পার্ক মেট্রোতে নেমে আমরা বিরাট আকৃতির তোরণ পেরিয়ে সেই স্মৃতিবিজড়িত স্থানে প্রবেশ করলাম। আসলে এ স্বপ্ন আমার বহুদিনের ছিল। যাঁকে নিয়ে এতদিনের গবেষণা, মনে হচ্ছিল আমি যেন এখানে রবি ঠাকুরের স্পর্শ পাচ্ছি। পুরনো জিনিসগুলো দেখতে, গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা ২টো ছুঁয়েছে বুঝতেই পারিনি। তারপর ঠাকুরবাড়ি তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে এলাম হোটেলে। সেখান থেকে ৫টার সময় গেলাম রবীন্দ্রসদন। সেখানকার পরিবেশও অদ্ভুত। কত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের আড্ডা-সমারোহ। মন কেমন করা একটা আমেজ। বাংলা আকাদেমির দ্বিতলে অনুষ্ঠানটি হল এবং সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। খুব ভালো মানুষ। একদিনের পরিচয়েই অনেকটা আপন করে নিয়েছিলেন।

সেদিনের অনুস্থানের পর আর একটা দিন ছিলাম কলকাতায় আমার দুই বন্ধু সুজয় আর গাজী (বাখের আলি গাজী) দায়িত্ব নিল, আমায় একদিনে পুরো কলকাতার যতটা দেখানো যায় দেখাবে। সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কলকাতার একটা জিনিস বড় অদ্ভুত সেটা হল রাস্তার নামের বৈচিত্র। হয়তো এমন হবে রাস্তার চেয়ে রাস্তার নাম বেশি। আমরা শুরু করলাম বেলুড় মঠ থেকে। সেখান থেকে বেশ কয়েকটা জায়গা ঘুরে সোজা ভারতীয় জাদুঘরে। সেখান থেকে বিড়লা তারামণ্ডল, কলকাতার একদম দক্ষিণে আলিপুর জু। এই দেখতে দেখেতেই বেলা পড়ে এল। গাজীর কথামতো আমরা গঙ্গার পাড়ে গেলাম সূর্যাস্ত দেখেতে। সে দিনটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা একটা দিন। অ্যাডভেঞ্চার আর প্রতিনিয়ত নতুন কিছু জানা। এভাবেই কলকাতা কলকাতার মানুষজন স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। সুযোগ হলে বার বার কলকাতা যাব। ভালোলাগার টানে, ভালোবাসার টানে... কবিগুরুর টানে...



# দেবব্রত বিশ্বাস

**শ্যামলী গঙ্গোপাধ্যায়**

ভারতীয় সংগীত জগতে বিশেষ করে রবীন্দ্র ঘরানার গানের বর্তমান শিল্পি থেকে শ্রোতা কিংবা যন্ত্রানুষঙ্গী এমন বোধহয় কেউই নেই যিনি দেবব্রত বিশ্বাসের নাম শোনেননি। আসল নাম দেবব্রত বিশ্বাস। বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে তার জন্ম ১৯১১ সালের ২৬ আগস্ট। সেই ছোটবেলা থেকেই মা অবলাদেবীর কাছে ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে তার পরিচয়। পরবর্তীকালে তিনি যে একজন স্বনামধন্য শিল্পী বা শিক্ষক হন তা-ই নয়, তিনি ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ও একজন গণসংগীত গায়কও বটে। তিনি দেশাত্মবোধক গান শিখেছিলেন মহেন্দ্র রায়ের কাছে এবং খুব অল্প বয়েস থেকেই কিশোরগঞ্জের স্বদেশি সভায় গান গাইতেন।

দেবব্রত বিশ্বাসের বাবা দেবেন্দ্রমোহন বিশ্বাস। তাঁর বাবা কালীমোহন বিশ্বাস ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করার ফলে নিজের গ্রাম ইটনা থেকে বিতাড়িত হন। সেই কারণে ছোটবেলায় কিশোরগঞ্জের স্কুলে দেবব্রত বিশ্বাস 'ম্লেচ্ছ' বলে বিবেচিত হতেন। ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সিটি কলেজে। এই সময় ব্রহ্মসমাজ ও পরে শান্তিনিকেতনে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে তাঁর যোগাযোগ বাড়ে। ১৯২৮ সালে ব্রহ্ম ভাদ্রোৎসবে কলকাতার সাধারণ ব্রহ্মসমাজ মন্দিরেই দেবব্রত প্রথম দেখেন রবীন্দ্রনাথকে। এরপর ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাশ করে ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্তান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে বিনা মাইনের চাকরিতে যোগদান করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে চাকরি পাকা হলে তাঁর বেতন ধার্য হয় ৫০ টাকা। এই চাকরিসূত্রেই রবীন্দ্রনাথের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছেলে সুবীর ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয় দেবব্রত বিশ্বাসের। মূলত এঁদের সূত্রেই রবীন্দ্রসংগীত জগতে প্রবেশ করেন জর্জ। ১৯৩৮ সালে প্রথম রবীন্দ্রসংগীতটি রেকর্ড করেন কনক দাসের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে। এই সময় থেকেই 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও অন্যান্য রেকর্ড সংস্থা তার গান রেকর্ড করতে শুরু করে। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। নজরুল তাঁর গান শুনে তাঁকে নিয়ে দুটি গান রেকর্ড করিয়েছিলেন। একটি 'মোর ভুলিবার সাধনায় সাধো বাধ' অপরটি 'আত্মজীবনী ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'-এ তিনি স্মরণ করতে পারেননি।

১৯৪৪ সালে 'তাসের দেশ' নৃত্যাভিনয়ে রাজপুত্রের গানগুলি গাওয়ার আমন্ত্রণ পান দেবব্রত। এই সময় থেকেই প্রথাগত রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয়। তিনি আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে বলেন, 'দু-তিন রাত অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর পরিচালক শান্তিদেব ঘোষ নাটকের শেষ গানটি 'বাঁধ ভেঙে দাও' আমায় গাইতে নির্দেশ দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম গানটি with pleasure গাইব না without pleasure গাইব?' তিনি with pleasure গাইবার নির্দেশ দিলেন। ...সেদিন আমি গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলিতে যেভাবে গানটি গাইতাম ঠিকক সেই ভঙ্গীতে দ্রুতলয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম। দেখতে পেলাম দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রশিল্পী কেলু নায়ার প্রাণের আনন্দে স্টেজের ধুল উড়িয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্যরা ঠিক সুবিধে করতে পারছেন না। ...বলাবাহুল্য পরে আর ওই গানটি আমায় গাইতে হয়নি।'

১৯৬৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন নিয়ে তাঁর মতভেদ শুরু হয়। মতভেদ তীব্র হলে তিনি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াই বন্ধ করে দেন। ১৯৭১ সালের পর থেকে আর তিনি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেননি। এই কারণে শিক্ষিতমহল ও বিশ্বভারতী কম সমালোচিত হয়নি। অবশেষে ২০০১ সালে ভারতে রবীন্দ্ররচনাবলীর কপিরাইট বিলুপ্ত হলে তাঁর বহু অপ্রকাশিত ও অনুমোদিত গান প্রকাশিত হয়।

দেবব্রত বিশ্বাস প্রায় ৩০০ রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেন। তাঁর অন্যান্য রেকর্ডের মধ্যে আছে 'ত্বমাদিদেব' ও 'ত্বমীশ্বরাণাং' বেদগান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'তুমি দেবাদিদেব' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ও প্রণমামি অনাদি অনন্ত' ব্রহ্মসংগীত, কবি বিষ্ণু দে রচিত কবিতার সুরারোপ কোথায় যাবে তুমি এবং বেশ কয়েকটি আধুনিক গান। তবে রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর প্রধান সংগীতক্ষেত্র ছিল। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে গীতা ঘটকের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি'; 'কোমলগান্ধার' ছবিতে 'আকাশভরা সূর্যতারা' এবং 'যুক্তি তর্ক ও গল্প' ছবিতে স্বয়ং ঋত্বিক ঘটকের ওষ্ঠদানে 'কেন চেয়ে আছ গো মা' গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। এছাড়া ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবির একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে তিনি অভিনয়ও করেন।

আত্মজীবনীতে দেবব্রত বিশ্বাসের যে পোর্ট্রেটটি ফুটে ওঠে তা এক অন্তর্মুখী, আত্মপ্রচারবিমুখ ইমোশনাল শিল্পীর; অতি সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এক দরদি গায়কের। তবুও মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরেও তিনি রবীন্দ্রসংগীত জগতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পীরূপে পরিচিত। 'মেঘে ঢাকা তারা'র মতো দেবব্রত বিশ্বাস আজ তিন দশক পরেও বাঙালির 'হৃদয়ে প্রাণের বারতা' লিখে চলেছেন।